মৌলবাদ : উৎস সন্ধান, ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন প্রেক্ষিত

-রবিউল ইসলাম

ভূমিকাঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, যে মতবাদ একদিন মানব সমাজকে মুক্তি দেয় বিপ্লবের মাধ্যমে, সেই মতবাদই কালের বিবর্তনে এক সময় মানুষের পায়ে বেড়ী পরিয়ে দেয় । সভ্যতার পথে তাকে এগোতে দেয় না । এক পা যখন সামনের দিকে যায়, অন্য পা তখন পেছন দিকে টেনে ধরে । ইতিহাসের পরতে পরতে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই অমর শিক্ষামূলক বাণীর সাক্ষ্য খুঁজে পাই । ইসলাম আরবের মানুষকে মুক্তি দিয়েছিল দাসত্ব, জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞানতা, মাৎসান্যায়, বংশানুক্রমিক হত্যাকান্ড এবং গোষ্ঠীপতিদের শোষন ও অত্যাচার থেকে । আরব বিজয়ে দক্ষিণ ভারতে এবং তুর্কীবিজয়ে উত্তর ভারতে একইভাবে না হলেও, বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল । প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ সুরজিত দাশগুপ্ত (জন্ম ১৯৩৪ সাল) তাঁর 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "একথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ইসলাম আগমনের পরিণামে (ভারতবর্ষে) ভক্তি আন্দোলনের জন্ম না হলেও ইসলাম অবশ্যই ভক্তি আন্দোলনকে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ ও প্রচুর প্রেরণা দিয়েছিল ।.....দক্ষিণ ভারত তথা দাক্ষিণাত্যে ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত শাসনের দুর্গে আঘাত হেনেছিল; সেই দুর্গে উত্তর ভারতে বা আর্যাবর্তে প্রবলতর আঘাত*[১] করেছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা" ।(**[১]) ইসলাম আগমনের(বিশেষ করে সুফী মতবাদের) অভিঘাতে বিচলিত উত্তর ভারতের বাইরে দ্রাবিড় দেশে ভক্তি আন্দোলনের জন্ম নিল, উত্তর ভারতে নিয়ে এলেন রামানন্দ, আর সপ্তদ্বীপ নবখন্ড পৃথিবীতে ভক্তি প্রচার করলেন তাঁর শিষ্য কবীর । কবীরের আহ্বানে সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের জীবনে এই সাধনা অচিরেই এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করে । উত্তর ভারতের মুদি, মুচি, মালি, সুতার, কুমার, নাপিত ও মেথর বৃত্তির লোকেরা, যারা ইসলামের সামাজিক সাম্যের প্রভাবে বিদ্রোহের সূচনা করে নিম্নবর্ণের ভক্তিবাদী সন্ত হয়েছিল, দেখল যে সাধারণ তুর্কীর মধ্যে ত' বটেই, দিল্লীর শাহীমহলেও, বাজারের ক্রীত দাস স্বীয় গুণে হচ্ছে প্রভূর জামাতা, সেনাপতি, অমাত্য এবং সুলতান । ব্যক্তি জীবনে আত্মোন্নয়নের এই সম্ভাবনা তাকালীন নিম্নবর্ণের ও বর্গের মানুষের মনোজগতে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটালো । জন্মসূত্রে সর্বপ্রকার অধিকারবঞ্চিত এই দলিতদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে মনুষ্যত্বের ও আত্মমর্যাদা লাভের আকাঙ্খা তাদেরকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহী করেছিল । সুতরাং এটা বলা যায় যে আরব বিজয়ে দক্ষিণ ভারতে এবং তুর্কীবিজয়ের প্রেক্ষাপটে উত্তর ভারতে ইসলামী সামাজিক সাম্যের প্রভাবে নবযুগের উন্মেষ সূচিত হয় । তাপর্যের দিক থেকে একে য়ুরোপীয় ইতিহাসের রেনেসাঁযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় । চৈতন্যদেবের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ লিখেছেন, "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন যে হিন্দুর সমাজ সংরক্ষণেরই ইসলাম প্রতিরোধক পরোক্ষ আন্দোলন, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ আর তর্ক নেই । কেবল বৌদ্ধ ও অনুরুপ শ্রেণিকেই নয়, ধর্মান্তরিত হিন্দুকেও সমাজে পূর্ণগ্রহণের সার্থক উপায় হিসাবেই যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর প্রত্যাশিত ফলও পাওয়া গিয়েছিল,..... .....ষোল শতক থেকেই বাঙলায় ইসলামের অব্যাহত প্রসার রুদ্ধ হয়ে গেছে,....." । **[২]

একই বক্তব্যের প্রতিফলন পাওয়া যায় কিছুটা ভিন্ন ভাষায় সুরজিত দাশগুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে। সুতরাং নির্মোহ দৃষ্টিতে একথা বলা যায় যে, ইসলাম ধর্মের প্রভাব একদিন ভারতবর্ষে মানবাত্মার মুক্তি ও সভ্যতার পথে যাত্রায় অবদান রেখেছিল, ধর্ম-সংস্কারক বা মানবতাবাদীদের জন্য মুক্তি-অন্বেষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী চিন্তার রসদ জুগিয়েছিল, মানুষকে পথ দেখিয়েছিল । হোসেন শাহের আমলকে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের রেনেঁসা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় । সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, সংগীতে

বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি, এযাবতকাল পর্যন্ত আধিপত্যকারী আর্য -সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল । ইতিহাসবিদ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ'-এ লিখেছিলেন-

> "বাঙ্গালা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গালার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ । আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুনে বাড়িয়া গিয়াছিল ।..... এই পাঠান যুগে সর্ব প্রথম হিন্দু সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল । ....ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলায় প্রচার করিলেন(শাসক শ্রেণীর ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের আধিপত্য আর মেনে নেওয়া হলোনা)।.... একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙলা ভাষায় ধর্মপ্রচার-এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নবভাবে জাগ্রত হইল । শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল ।... এই পাঠান-প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল, এই স্বাধীনতার ফলে বাঙলার প্রতিভার যেরুপ অদ্ভূত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রুপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই ।"

যে ইসলামের প্রভাবে বাঙলায় একদিন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, ভক্তি আন্দোলন ও সর্বশেষে রেনেসাঁ সূচিত হয়েছিল, সেই ধর্মই আজ পশ্চাদ্‌পদতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, অগ্রগতির পথে অচলায়তনের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা শুধু দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত চিরন্তন বাণীকেই প্রতিভাত ও প্রাসঙ্গিক করে তুলছে ।

আজ ধর্মগুলি সারা বিশ্বে মানব সভ্যতার যাত্রাপথে এক বিশাল বোঝা হয়ে পড়েছে বলে মনে হয় । ধর্মতাত্ত্বিকরা যত তাত্ত্বিক ও পুথিগত ব্যাখ্যাই দেন না কেন, বাস্তব অবস্থাটি হচ্ছে, ধর্মকে আশ্রয় করেই আজ এক প্রায় এক শতাব্দী ধরে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উগ্রবাদের দৈত্য বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে । দার্শনিক নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০)*[২] এই বলে চার্চকে আক্রমণ করতেন,

> 'জীবন প্রবাহ ও জীবনচেতনা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কিন্তু চার্চ মানুষের জীবনকে ডিমের খোলসে আবদ্ধ করে রাখে । মানুষের ভিতরের অনন্ত সম্ভাবনা ও প্রচন্ড শক্তিকে চার্চ ও ধর্ম রুদ্ধ করে রাখে ।'

ধর্ম সম্বন্ধে নীৎসের এই মূল্যায়ন স্থান ও কালের বিচারে চূড়ান্ত নয়-ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে নয়, তা আমরা উপরে দেখিয়েছি । যে সময় বা দেশের (বা মহাদেশের) প্রেক্ষাপটে তিনি এ কথা লিখেছিলেন, সেই কালপর্বে বা তাঁর পূর্ববর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তিনি সম্ভবত মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীলতার প্রসার তথা আধুনিকতার পথে মুখ্য প্রতিবন্ধকরুপে ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল ও অশুভ ভূমিকাকে বিবেচনা করেছেন । এখানে উল্লেখ করা খুব প্রাসঙ্গিক যে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে(অর্থা তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে) অনুষ্ঠিত নায়াগ্রা কনফারেন্স ধর্মীয় শুদ্ধতা বা রক্ষণশীলতার নামে ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে । তাই এটা বোধগম্য যে সমকালীন ধর্মীয় কূপমন্ডুকতা প্রত্যক্ষ করে তিনি উপরোক্ত উক্তিগুলি করে থাকতে পারেন । সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর চিন্তাধারাকে সম্ভবত অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল, যা হয়তো অনেকের বিচারে দেশ-কালের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, কাব্য ও দর্শনের চিরকালীন ও সার্বজনীন আবেদনের জন্যই তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে ফ্রেড্রীখ নীৎসের উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি সমসাময়িক বিশ্ব ও বাংলাদেশের চলমান সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও বাস্তব । সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে মৌলবাদের একটি অনুসঙ্গ মাত্র। তবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ এক নয়। আমরা যথাসময়ে এ দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ও ধারণাগত (conceptual) পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণ করব । কিন্তু, কেন মৌলবাদ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের কাছে, প্রগতিশীল চিন্তার সচেতন মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ-ইস্যুতে পরিণত হলো ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে আজকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব । তবে তার কিছুটা আভাস পাঠক ইতিমধ্যেই পেয়েছেন নিশ্চয়ই । স্বাধীনতার পর জিয়ার ক্ষমতারোহনের পর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার হীনস্বার্থ মাথায় নিয়ে, সৌদি রাজপরিবারের সমর্থনের আশায় এবং অভ্যন্তরীনভাবে সামরিক এষ্টাব্লিশ্‌মেন্টের রাজনীতিতে স্থায়ীভাবে(কখনো প্রকাশ্যে, কখনো নেপথ্যে) প্রভাব বিস্তারের স্বার্থে, এবং 'I will make politics difficult for the politician'-এই চাণক্য-ডকট্রিনের বাস্তবায়নের উদ্দ্যেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বাধীনতাবিরোধী জামাতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসন করা শুরু করেন । সেই থেকে শুরু করে, এবং বিএনপির '৯১-'৯৬ সাল ও ২০০১-২০০৬ সালের শাসনপর্বে যথাক্রমে নেপথ্যে ও প্রকাশ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে জামাআত ও তার অঙ্গ-সংগঠনগুলো তাদের সক্রিয় ক্যাডারদের দেশের সামরিক বাহিনী, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ, পিএসসি থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নজীরবিহীন দলীয়করণের মাধ্যমে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে এগোতে থাকে । এর মধ্যে জামায়াত-শিবিরের একটি অংশ, কৌশলগত কারণে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা', 'বাংলা ভাই' ইত্যাদি বিভিন্ন নাম নিয়ে , (যেমন করে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভক্তদের কাছে বুদ্ধ বুড়ো শিবরুপে পূজিত হয়েছিলেন) বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে সামরিক প্রশিক্ষন ও নানা জঙ্গী তৎপরতা শুরু করে ।

১) বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি আফগানিস্তানের মতো একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হবে কিনা, এটিকে একটি মধ্যযুগীয় ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে কিনা সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে প্রগতিশীল মহলের মধ্যে ।

২) মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার মানুষদের জন্য, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তার মানুষদের জন্য অদূর ভবিষ্যতের বাংলাদেশ আদৌ নিরাপদ থাকবে কিনা ?

৩) যে প্রত্যাশা, লক্ষ্য, স্বপ্ন, আদর্শ ও চেতনা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা আজ ভুলুণ্ঠিত । ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, বুদ্ধির মুক্তি এবং বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত চেতনাগুলি জাতীয় জীবনে ও সংবিধানে পুনপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা কি বাংলাদেশে আরেকটি নবজাগরণ ও সংস্কারমুক্তির লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন (Enlightenment) সূচিত করতে পারব কিনা, একটি জ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন শোষনহীন আধুনিক সমাজ নির্মাণের দিকে এগিয়ে যেতে পারব কিনা, নাকি অদৃষ্ট ও ঐশীনির্ভর, আধা-রাজতান্ত্রিক এবং সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় একটি পুরোপুরি কূপমন্ডূক, বদ্ধ ও বন্ধ্যা সমাজের(এই বন্ধ্যাত্ব ইতিমধ্যেই সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত) দিকে ধাবিত হবো, প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর তথা ভিক্ষুক-অর্থনীতির দেশে পরিণত হবো ?

৪) বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান পরাশক্তিগুলির জন্য সামরিক দিক থেকে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চট্টগ্রাম বন্দর, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এবং বাংলাদেশের তেল-গ্যাসের সম্ভাব্য(Anticipated) নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও ক্রম-উ□পাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ শক্তিগুলোর যে

লোলুপ দৃষ্টি বহুদিন যাবৎ এ দেশটির উপর রয়েছে, তা দেশটির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বর জন্য হুমকিস্বরুপ ।

এখন, আজকের ইরাক-যুদ্ধ থেকে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্রগুলো কি শিক্ষা নিতে পার ? ইরাকে যে এখনো মার্কিনীরা অবস্থান করতে পারছে, ওখানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য তথা এনার্জি সেক্টর(বিদ্যুত, তেল গ্যাস আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) টেলিফোন, ব্যাংকিং ইত্যাদি যেসব সেক্টরগুলি জনগনের মালিকানায় ছিল, সেগুলি এখন বিশ্বায়ন ও প্রাইভেটাইজেশনের নামে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, তার কারণ শুধু এই নয় যে ওখানকার শাসক এলিট ও দেশপ্রেমহীন বুর্জোয়াদের একটি অংশ এবং সামরিক-বেসামরিক এষ্টাব্লিশ্‌মেন্ট নিজেদের অবস্থানগত ও শ্রেণিগত স্বার্থে মার্কিনীদেরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে । কারণটি হলো আরো গভীরে,সেটি তাদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক সমস্যা-ঐতিহাসিক ও অংশত অদূরদর্শী সাদ্দামের দীর্ঘ দিনের শিয়াবিরোধী সাম্প্রদায়িক দমন-পীড়ন নীতির কারণে ইরাকে সত্যিকারের কোন জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারেনি । শিয়াদের প্রতি সাদ্দাম আমলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় । শিয়া-সুন্নী বিভেদ ছাড়াও গোত্রে-গোত্রে বিভেদ, স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা হিসেবে কুর্দীদের স্বাধীনতা দাবী ইত্যাদি সমস্যা ইরাকের সমাজে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে । দীর্ঘ দিনের এই গোত্র-বিভক্তি (sectarianism), সাম্প্রদায়িক বিভক্তি এবং কুর্দী, এজীদী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি তথা ভিন্ন জাতিপরিচয়কে যথাযথভাবে মর্যাদা ও মূল্যায়ন না করার কারণে ইরাক কখনই একটি জাতিরাষ্ট্র (Nation state) হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি । কুর্দীদের ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মেনে নিয়ে, অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়াতাবাদ বিকাশ লাভ করতে পারেনি কোন দূরদর্শী ক্যারিশমেটিক নেতার অভাবে । তো এমনি একটি পটভূমিতে, যখন ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন সংগঠিত হলো দেশটির তেলসম্পদ গ্রাস করার জন্য(যার মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপি এনার্জি তথা জ্বালানী সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে য়ুরোপ , রাশিয়া ও চীনের উপর খবরদারি ও আধিপত্য বিস্তার; তাছাড়া তেলের নিশ্চিত সরবরাহের সাথে একটি শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতির বহু সূচক নির্ভর করে, যা ভিন্ন আলোচনার বিষয়), তখন ইরাকে সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ কোন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেনি । এর আরেকটি কারণ, একদিকে, সাদ্দাম আমলে বৈষম্যের শিকার শিয়াদের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে এলিট অংশটি মার্কিনীদেরকে ক্ষমতা ও তথাকথিত গনতন্ত্রের লোভে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে । প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে বহু দলাদলি ও বিভক্তি কাজ করছে, যার অন্যতম কারণ হলো 'আয়াতুল্লা প্রথা'*[৩]। আবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বহিরাগত হিসেবে 'গোদের উপর বিষফোঁড়ার' মত মৌলবাদী সংগঠন 'আলকায়েদার' মার্কিনীদের শায়েস্তা করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ইরাকের মাটিকে বেছে নেয়া, যারা শিয়াদের উপর মার্কিন-প্রীতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যে বর্বর হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে তা জাতির বিভক্তি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ইরাকের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি ?

১. ব্যক্তির খেয়াল-খুশী, উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থকরণে ও ক্ষমতা নিরঙ্কুষ করার স্বার্থে যে স্বৈরাচারী ও বৈষম্যমূলক শাসন চালানো হয় দীর্ঘদিন ধরে, তা ঐ শাসক সম্প্রদায় বা রেজিম যতদিন ক্ষমতায় থাকে ততদিনই ঐ অগণতান্ত্রিক সিস্টেমটি কাজ করে, এরপর যখন ঐ রেজিমের পতন ঘটে, তখন ঐ সিস্টেমের ক্ষতিকর দিকগুলি বেরিয়ে পড়ে ।

২. সাদ্দান শাসনামলে ইরাক রাষ্ট্রটির(খেয়াল করুন, জাতি নয়) অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন অসামঞ্জস্য, বৈষম্য, বিভক্তি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি রোগগুলি ভেতরে ভেতরে বিরাজমান ছিল, তা কিন্তু সাদ্দামের বাথ পার্টির দোর্দন্ড-প্রতাপ স্বৈরশাসনের মধ্যে মানুষের কোন বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও তথ্যের স্বাধীনতা প্রভৃতির অভাবের কারণে চাপা পড়ে গিয়েছিল । কিন্তু, তার মানে এই নয় যে সমস্যাগুলি ছিলনা, তবে সেগুলি প্রকাশ হওয়ার সুযোগ ও পরিবেশ পায়নি ।

এখন মার্কিনীরা আসার পর,(যেমন সেন রাজবংশের পতন-পর্বে মুসলিম শক্তির আবির্ভাবে-[যাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য-জয় বা অর্থসম্পদলুন্ঠন] ত[]কালীন হিন্দু সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশই মুক্তির স্বাদ পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বহুবছর ধরে অবদমিত থেকে হঠা[] করে মুক্তির স্বাদ পেলে যা হয়(বিষ না অমৃত তা' বিচারের ক্ষমতা আর থাকেনা), পেন্ডোরার বাক্স*[৪] খুলে গেল । প্রথম-প্রথম গণতন্ত্র মনে করে যেভাবে আহ্লাদিত হয়েছিল নির্বোধের মত, ধাক্কা খেয়ে এখন ধীরে ধীরে ভুল ভেঙ্গেছে ।

এতক্ষণ ধরে ইরাক নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করা হলো, তার উদ্দেশ্যটা আশা করি পাঠক হৃদয়নঙ্গম করেছেন । আমি চার নম্বর পয়েন্টের বক্তব্যের শুরুতে (উপরে দেখুন) ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের কৌশলগত বিপজ্জনক অবস্থান এবং তেল-গ্যাস-বন্দর-সেন্ট মার্টিন দ্বীপ প্রভৃতির বিপজ্জনক দিকগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম । এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে ইসলামীক সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও মৌলবাদী উত্থাণের সুবাদে,(যার পৃষ্ঠপোষকতা যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে চলেছে) যদি এখানে পশ্চিমা শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি হয়, শিক্ষিত শ্রেণীর একটি অংশ এবং সেনাবাহীনীর হাতে নির্যাতিত উপজাতিগোষ্ঠীগুলো ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদেরকে সহযোগিতা না করলেও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মত কোন প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে বলে মনে হয়না । গ্রামে-গঞ্জের অগণিত হতাশ মুক্তিযোদ্ধা, যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে এবং বহুস্থানেই স্থানীয় রাজাকারদের কাছে ব্যক্তিগত বা সরকারী বাড়ী বা সম্পত্তি হারিয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে বিএনপি-জামাআত সরকারের সময়, তাদের সন্তানরা হিসেব করবে নিশ্চয়ই যে '৭১-এর যুদ্ধে গিয়ে তাদের বাবারা কি পেয়েছিল । তারা দেশটিকে সেনাবাহীনীর দেশ, গ্রাম্য চেয়ারম্যান-টিএনও-ডিসি-এসপি-আমলা-এলিট-মু[]সুদ্দি ব্যবসায়ী বা বুর্জোয়া-(সেনাবাহিনীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও ভাগীদার)সিন্ডিকেট চক্র প্রভৃতি নব্য মৌলিক গণতন্ত্রের(আইয়ুব খানেরটা ছিল পুরনো মডেল) হালুয়াভোগীদের দেশ বলেই ভাববে-নিজেদের দেশ বলে ভাববেনা । মোদ্দা কথা, দেশটির মানুষ কার্যত দুই ভাগ-চতুর্ভাগ হয়ে যাবে । অবশ্য বাংলাদেশে এখনই প্রকৃত প্রস্তাবে দুটো জাতি বাস করছে অন্তর্গত মননের দিক থেকে এবং জাতিসত্ত্বার প্রশ্নে । এক পক্ষ হলো যারা নিজেদের বাঙালী বলেই মনে করে-যারা অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তায় বিশ্বাসী । অন্য পক্ষ মুসলিম জাতীয়তা ও পাকিস্তানী সংস্কৃতি এবং পাকিস্তানী জাতীয়তায় বিশ্বাস করে, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'পাকিস্তান ভাঙা' বলে মনে করে এবং তারা মনে মনে নিজেদেরকে পাকিস্তানী বলে গর্ববোধ করে । বিদেশী শক্তি অনুপ্রবেশের সাথে সাথে এ দুটো জাতির মধ্যে হানাহানি শুরু হতে পারে এবং বাংলাদেশ নামক ভুখন্ডটিকে পুনর্দ্বিখন্ডিতকরণের প্রস্তাব বা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে ।

আমাদের জাতিপরিচয় বা আত্নপরিচয়ের যে সংকট, তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা । মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এমন দুটি বিষাক্ত রোগ যার চিকি[]সার পূর্বে

রোগ দুটিকে ভাল করে জানতে হবে । আর মৌলবাদ যদি অন্তর্নিহিত দূরারোগ্য রোগের সিম্প্টম হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে রোগটিকে আগে জানা । রোগটিকে না জানলে রোগের ডায়াগনসিস আমরা করতে পারব না ।

১. সংজ্ঞা নিরুপণ-মৌলবাদের অন্যতম উৎপত্তিস্থান ও চারণভূমি মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের ধর্ম ও মৌলবাদ বিষয়ক পন্ডিত এবং ইসলাম-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ব্রুস লরেন্স*[৫] মৌলবাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-

> 'Fundamentalism is a multifocal phenomenon precisely because the modernist hegemony, though originating in some parts of the west, was not limited to Protestant Christianity'(emphasis added)**[৩].

অর্থা, মৌলবাদ হচ্ছে একটি বহুকেন্দ্রিক প্রপঞ্চ যা আধুনিকতাবাদের প্রভাব বা আধিপত্যের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত হয় । এটি পাশ্চাত্যের কোন কোন অংশে উদ্ভব ঘটলেও প্রটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ।

অন্যত্র তিনি বলছেন,

> "Fundamentalism is an ideology and vision of the world that can not be labeled and identified."

কারণ পরিচয় বা 'identity'*[৬] (sameness, identical or একরুপতা, অভিন্নতা)-র প্রশ্ন উঠলে "সংজ্ঞার প্রশ্ন আসে বা খোঁজ করতে হয়" । তিনি বিশ্বাস করেন যে "ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্ম-পরিচয় পরস্পর বিরোধী ।"এই ডিউক য়ুনিভার্সিটি প্রফেসরের মতে, মৌলবাদ 'বিমূর্ত ধারণা বা বিশেষায়িত ধারণাভিত্তিক এবং আঞ্চলিক সীমানার পত্তন ঘটায় ।" 'Identity'-র সাপেক্ষে মৌলবাদের এই সংজ্ঞায়ন এই লেখক ত্রুটিমুক্ত বলে মনে করে না-এটা নিছক তাত্ত্বিক বিশ্লেষন । সম্ভবত, তাঁর প্রফেসরসুল্ভ উদারতা(যা পশ্চিমী সভ্যতা ও রেনেসাঁজাত liberalism-এর নামান্তর) ও বৈচিত্রপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তিনি এভাবে দেখেছেন । তবে এই সিদ্ধান্তের ত্রুটিপূর্ণ দিক সময়মতো দেখানো হবে ।

মৌলবাদ সম্পর্কে প্রফেসর লরেন্সের আরো সংজ্ঞায়ন হচ্ছেঃ"the affirmation of religious authority as holistic and absolute, admitting of neither criticism nor reduction; it is expressed through the collective demand that specific creedal and ethical dictates derived from scripture be publicly recognized and legally enforced ।"(**[৪])

অর্থাৎ, মৌলবাদ হলো "ধর্মীয় কর্তৃত্ব(ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) বা অধিকার যাতে ধর্মকে মোক্ষ এবং ব্যাখ্যাতীত বলে দাবী করা হয় । যা কোন সমালোচনা বা লঘুকরনকে স্বীকার করেনা । যৌথ বা সামষ্টিক দাবীর মাধ্যমে এটা প্রকাশ করা হয় যে, ধর্মশাস্ত্র থেকে পাওয়া সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও নীতিশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিকে গণস্বীকৃতি প্রদান করা হোক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হোক।" লরেন্স যুক্তি দিচ্ছেন যে, উক্ত মতবাদ দার্শনিক যুক্তিবাদিতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে প্রত্যাখ্যান করে যা আধুনিকতার সহগামী, কিন্তু প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে, যা আবার আধুনিক যুগেরই বৈশিষ্ট্য । সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মৌলবাদকে আখ্যায়িত করা যায় সংস্কারমুক্ত মূল্যবোধের বিরোধিতা দিয়ে । তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৌলবাদ হচ্ছে একটি বিশ্বময় প্রপঞ্চ এবং একে সুনির্দিষ্টভাবে

ব্যাখ্যা বা বোঝার পূর্বে অবশ্যই এর পূর্বসূত্র বা পরিপ্রেক্ষিতগুলির তুলনামূলক বিচার করতে হবে ।

অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক ল্যুডভিগ উইট্‌জেন্‌ষ্টাইন (Ludwig Josef Johann Wittgenstein;1889-1951) বিশ্বব্যাপী মৌলবাদী প্রবণতার যোগসূত্র বোঝাতে গিয়ে পারিবারিক সাদৃশ্যতার (Family Resemblance)*[৭] -এর তত্ত্বটি প্রথম উদ্ভাবন করেন । তাঁর এই সাদৃশ্যতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উইট্‌জেন কতগুলি খেলার উদাহরণকে বেছে নেন-যেমন, বোর্ড খেলা, বল খেলা, অলিম্পিক গেম্‌স্‌ এবং ইত্যাদি। এতে সবগুলি খেলার যে আবশ্যিকভাবে একটি একক সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে এমন কোন কথা নেই(টীকা দেখুন; *৭) । লরেন্স মৌলবাদের পাঁচটি সাধারণ "পারিবারিক সাদৃশ্যতাকে" তালিকাভুক্ত করেছেন-

১) মৌলবাদ সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক । তারা নিজেদেরকে সমাজের ন্যায়পরায়ণ অবশেষরুপে দেখে । এমনকি তারা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ তখনও নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টরুপে উপলব্ধি করে।

২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা সেক্যুলারপন্থী ও পথভ্রষ্ট ধর্মানুসারীদের বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন এবং যুদ্ধংদেহী-ভাবাপন্ন ।

৩) তারা সমাজের দ্বিতীয় পর্যায়ের এলিট শ্রেণীর(পেটিবুর্জোয়া) পুরুষ যারা নিয়তই ক্যারিশমেটিক পুরুষদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় । ৪) মৌলবাদীরা তাদের নিজস্ব পরিভাষার জন্য শব্দাবলীর উদ্ভব ঘটায় । ৪) মৌলবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে তবে কোন আদর্শিক অগ্রদূত নেই ।

উপরোক্ত সংজ্ঞায়নও ত্রুটিমুক্ত নয় এই জন্য যে, এতে (আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও অতিপরিচিত) মৌলবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য বাদ পড়ে গেছে । তা হলো, এটি আধুনিকতা ও প্রগতিবিমুখ এবং অচলায়তনপন্থী তথা গতিশীলতার বিরোধী ও প্রতিবন্ধক ।

প্রফেসর রিচার্ড টি. এন্টন মৌলবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন -এভাবে- "Fundamentalism is only one response to the 'cultural disqualification of all traditions bearing a unified code of meaning in a world committed to rapid change and pluralization. ... fundamentalism is a transnational religious phenomenon that has entered many domains of culture and social organization with startling consequences for the individual, the intimate social group and the nation-state".(**[৫])অর্থা "মৌলবাদ শুধু প্রথাগত ঐতিহ্যগুলির সাংস্কৃতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি একটি প্রতিক্রিয়া । যেগুলি(যে ঐতিহ্য বা মূল্যবোধগুলি) দ্রুতগতির পরিবর্তন ও বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ধর্মীয় আদর্শের অন্তর্ভুক্তিকরণ, সহাবস্থান ও পারস্পরিক বিনিময় প্রক্রিয়ার (বহুত্বকরণ-Pluralization)*[৮] প্রতি সমর্পিত একটি বিশ্বে তা পর্যবাহী সূত্রবদ্ধ আইন বা বিধিমালাকে ধারণ করে ।মৌলবাদ হলো কোন দেশের একটি গোষ্ঠীর বা বিশেষ জনসমষ্টির ধর্মীয় স্বপ্নবিলাস বা উচ্চাকাঙ্খামূলক প্রবণতা বা প্রপঞ্চ যা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে । যার পরিণতি ব্যক্তিমানুষ, ঘনিষ্ট সামাজিক বর্গ এবং জাতিরাষ্ট্রের জন্য হয়েছে অভাবনীয়" ।

অধ্যাপক আহ্‌মদ শরীফ মৌলবাদের সংজ্ঞা প্রসংগে বলছেন-"মৌলবাদ ইংরেজী Fundamentalism-এর বঙ্গানুবাদ । আর 'Foundation' থেকে এর উপত্তি ধরলে এ প্রতিশব্দ হবে

'ভৈত্তিকতা' । প্রটেষ্টান্ট ধর্মের পরিশীলিত যৌক্তিক সংস্কৃত রুপান্তরকেই ১৮৯৫ সনের নায়েগ্রা সম্মেলনে 'Fundamentalism' নাম দেওয়া হয়েছিল । তখন থেকেই শব্দটা প্রতিচ্য দেশে চালু হয়েছে । এর স্থিতি হচ্ছে খ্রীষ্টীয় কেরামতিতে অবিচল পাঁচটি আস্থা-প্রশ্নহীন বিশ্বাস । মার্কিন স্বার্থে সেই মৌলবাদ এখন তৃতীয় বিশ্বের এক মহা শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । মৌলবাদী বদ্ধচিত্তের এবং পরমত অসহিষ্ণু না হয়েই পারে না । কেননা সে নিজের শাস্ত্র ব্যতীত আর সব শাস্ত্রকেই ভুল-ত্রুটিবহুল মিথ্যে বলে জানে, মিথ্যের সঙ্গে আপোসে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থান অবশ্যই পাপ"**[৬] । অন্য একটি প্রবন্ধে**[৭] তিনি বলছেন-

> "Orthodoxy ও Fundamentalism প্রায় অভিন্ন । ..... ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদীদের সঙ্গে গোঁড়া রক্ষণশীল শাস্ত্রনিষ্ঠ অর্থোডক্সদের পার্থক্য হচ্ছে মৌলবাদীরা ঐহিক জীবনে সুবিধেবাদী রাজনীতি সচেতন এবং কোনো নীতিতে-নিয়মে-আদর্শে আন্তরিকভাবে নিষ্ঠ নয়, কেবল শাস্ত্রধ্বজী হয়ে এরা পার্থিক সুখ সুবিধে-বাঞ্ছা চালিত হয় । এদের ধার্মিক এবং পারত্রিক জীবনে গুরুত্ব এবং আস্থাশীল লোকের একান্ত অভাব । এদের শাস্ত্রে সত্যে আদর্শে ও চরিত্রে নিষ্ঠা বড় কম বা প্রায় নেই-ই । এ কাপট্য হিন্দু মৌলবাদীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট । কেননা এদের মধ্যে অভিন্ন উপাস্য নেই । উপাসনা-পদ্ধতি এবং শাস্ত্র-তত্ত্বও অভিন্ন নয় । সৌর-শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-লিঙ্গায়েত মিলে কি একদলীয় মৌলবাদী হতে পারে" ?

পাঠক যদি একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখবেন, প্রফেসর লরেন্স প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং আহ্মদ শরীফের সংজ্ঞার মধ্যে ভাষাগত বা প্রকাশভঙ্গীর কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও অন্তর্গত মিলই বেশী । দুজনই অসহিষ্ণুতা, বদ্ধচিত্ততা বা রক্ষণশীলতা ও প্রশ্নহীন বিশ্বাস-এই দিকগুলো দেখিয়েছেন । লরেন্সের ভাষায় ধর্মের "সমালোচনা বা লঘুকরণ" স্বীকার না করা এবং ধর্মকে "absolute" বা মোক্ষ ও ব্যাখ্যাতীত(Holistic) দাবী করার মধ্য দিয়ে এই অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি ধরা পড়ে । রিচার্ড এন্টন বর্ণিত "দ্রুতগতির পরিবর্তন ও বহুত্বকরণ বা বহুত্ববাদিতার" (rapid change and pluralization) এবং প্রফেসর লরেন্স বর্ণিত "আধুনিকতাবাদের আধিপত্য বা প্রভাব"(modernist hegemony)-এর প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আহ্মদ শরীফের ব্যবহৃত "বদ্ধচিত্ততা" বিশেষ্যটির মর্মার্থ বা ভাবটি প্রতিফলিত হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে আহ্মদ শরীফের সংজ্ঞার মধ্যে বেশ সীমাবদ্ধতা আছে । তিনি অর্থোডক্সি ও ফান্ডামেন্টালিজ্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন(উপরে) সেটা য়ুরোপ-আমেরিকার মৌলবাদের জন্য সত্য নয়-অর্থোডক্স চার্চের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেই মার্টিন লুথার ও পরে জন ক্যাল্ভিন প্রমুখের নেতৃত্বে প্রটেষ্টান্ট মৌলবাদীরা সংস্কার আন্দোলন করেছিল । পক্ষান্তরে প্রফেসর লরেন্সের সংজ্ঞায় কিছু ত্রুটি থাকলেও তুলনামূলকভাবে অনেক ব্যাপক ও এবং গভীর অর্থ ধারণ করে । তাই, ব্রুস লরেন্সের সংজ্ঞাকে আমরা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলে গ্রহণ করতে পারি । প্রফেসর রিচার্ড এন্টনের সংজ্ঞাও কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনেকটাই ব্যাপক । তবে সংজ্ঞগগুলির মধ্যে কোনটির সীমাবদ্ধতা থাকলেও অন্যটির মাধ্যমে সে অপূর্ণাঙ্গতা দূর হয়েছে বলা যায় । এটাই লেখকের তিনটি সংজ্ঞা দেওয়ার কারণ ।

২. গোড়ার কথা- ক)এখানে প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়ার দরকার, ভারত-বাংলাদেশের কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক যে দাবী করেছেন, যে মৌলবাদের জন্ম মূলত ফ্রান্সে, তা পুরোপুরি সঠিক নয় । ভৌগলিক অর্থ সঠিক হলেও চুলচেরা বিচারে সঠিক নয় । এ অনুমানের সপক্ষে তাঁরা যথেষ্ঠ আলোচনা করেননি । যেমন, সুরজিত দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন, যে আধুনিক মৌলবাদের জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপের জেনেভা শহরে জাঁ(John Calvin, 1509-1564) ক্যাল্ভিন-এর নেতৃত্বে । কিন্তু, ফ্রান্সের জেনেভাকে মৌলবাদের জন্মভূমি বলে পাশ্চাত্যের খুব

কম ঐতিহাসিক বা গবেষক স্বীকার করেন । জাঁ ক্যাল্ভিন সম্পর্কে বহু বিতর্ক রয়েছে মার্কিন গবেষক ও গ্রন্থকারদের মধ্যে । প্রকৃত ঘটনা হলো, প্রথম জীবনে যাজক ক্যাল্ভিন ইটালীর রেনেসাঁ ও সমকালীন ফ্রান্সের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন বা Enlightenment- এর ভাবাদর্শ দ্বার প্রভাবিত Humanism (তাকালে হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের আরেকটি ধারা) মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও(১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ) পরে শুধুমাত্র চার্চের ঐক্য ও রাষ্ট্রের উপর চার্চের প্রভাব-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি যখন প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের Liberal art-এর ছাত্র ছিলেন, তখন ক্রীশ্চান সন্যাসী ও ঈশ্বরতত্ত্ববিদ মার্টিন লুথারের নেতৃত্ব (ধর্মীয়) সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার চলছিল ফ্রান্সে, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানো । এটা ছিল চার্চেরই বিভিন্ন পদবীর যাজকদের (Clergyman, Pastor etc) একটি আন্দোলন । তিনি মনে মনে এর সমর্থক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে তাঁর লেখা বইয়ে**[৮] । তবে য়্যানাবাপ্টিস্টদের (Anabaptist)*[9]- দের 'মুক্ত চার্চ' আন্দোলনকে তিনি চার্চের ঐক্য ও চার্চীয় এষ্টাব্লিশ্‌মেন্টের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন । এদিক থেকে ক্যাল্ভিনকে ক্ষমতাপন্থী বলা যেতে পারে । তবে এটাও ঠিক যে লুথারপন্থীদের উপর যখন অর্থোডক্স চার্চ কর্তৃপক্ষের দমনপীড়ন চলছিল, তিনি সে সময় একজন খ্রীষ্টানের জন্য বিবেকের স্বাধীনতা এবং শাসকদের জন্য সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মত দিয়েছিলেন । অবশ্য পরে বিবেকের স্বাধীনতার ব্যাপারে তাঁর এ অবস্থান থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ভিন্নমতাবলম্বী আচরণের জন্য বা ভিন্ন ধর্ম-ব্যাখ্যা বা ধর্মবিশ্বাসের জন্য সার্ভেটাসকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল চার্চীয় পবিত্রতা রক্ষার নামে এবং এই ট্রায়ালে তিনি নিজের প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছেন পুরো সিটি প্রশাসন ও চার্চের কাঠামোকে ব্যবহার করে জুরিদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে ।

আহ্‌মদ শরীফও একটি প্রবন্ধে**[৯] লিখেছেন যে মৌলবাদের জন্ম ফ্রান্সে, যা আসলে পুরোপুরি সঠিক নয় । প্রফেসর ব্রুস লরেন্সের মতো ধর্ম ও মৌলবাদ বিষয়ক মার্কিন পন্ডিতের লেখাতেও এর সপক্ষে কোন কথা নেই । জাঁ ক্যাল্ভিনের জীবনীকার এলিস্টার ই. ম্যাকগ্র্যাথ**[১০] এবং ডোনাল্ড কে. ম্যাককিম**[১১] কারও লেখাতেই কোন লেশমাত্র ইঙ্গিত বা আলোচনা নেই যে, ক্যাল্ভিনীয় মতবাদ (Calvinism)-কে পরে আমেরিকায় প্রটেষ্টান্ট মৌলবাদের উসরুপে বা চেতনা বা আদর্শগত ভিত্তি ও প্রেরণারুপে ব্যবহার করা হয়েছে । অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে এর স্বীকৃতি নেই কারণ সম্ভবত ফ্রান্সে 'মৌলবাদ' শব্দটি তখনও ব্যবহার শুরু হয়নি বা এর সাথে ভাবগত পরিচিতি ছিল না । পাঠকের কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে, যখন এ ব্যাপারে যথাসময়ে বিস্তারিত আলোচিত হবে ।

খ) যদিও মৌলবাদী চিন্তাধারার ইতিহাসের বেশীরভাগই যুক্তরাষ্ট্রেই উদ্ভব ঘটেছিল, এসব প্রপঞ্চ ছিল ষোড়ষ শতাব্দীর য়ুরোপে সংঘটিত অনেকগুলি ধারাবাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক(আন্দোলনের) ধারার প্রতিক্রিয়া । প্রথম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আদিকালীন চার্চের সময় থেকে য়ুরোপীয় এনলাইটেন্‌মেন্টের সময় পর্যন্ত কালপর্বে এই ধারণাটি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, বাইবেলের বাণী খোদার কাছ থেকে কতিপয় গ্রন্থকারের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে । (বাইবেলীয় গ্রন্থমালা) প্যান্‌টেট্যুখের (Pentateuch)*[১০] মূসায়ী ঐশীত্বের*[১১] ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের সমালোচনাগুলোর একটি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের জার্মানীতে করা হয়েছিল । যখন সংস্কারবাদী পন্ডিত কার্লস্‌টেড একটি রচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, মূসা(সঃ)-র মৃত্যুবর্ণনা(বাইবেলীয় অন্যতম ধর্মগ্রন্থ 'ড্যুটারোনমী'; ৩২:৫-১২) এবং উক্ত ধর্মগ্রন্থের অবশিষ্ট অংশগুলির মধ্যে বেশকিছু আক্ষরিক বা সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । যেহেতু কার্লস্‌ডেট দেখিয়েছেন যে, মূসা(সঃ)-র পক্ষে নিজের মৃত্যু নিয়ে

লিখে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তিনি উপসংহার টানলেন, যে একই লোকের দ্বারা গ্রন্থটির উভয় খন্ড লিখিত হয়েছে । তাই সেই ব্যক্তি মূসা হতে পারেনা .....এভাবে পরবর্তীকালে আরো অনেক খ্রীষ্ট ধর্মশাস্ত্রীয় পন্ডিত এব্যাপারে প্রকল্প (Hypothesis) দেন এবং পরীক্ষানিরীক্ষা চালান । যাতে দাবী করা হয় যে, ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament)*[১২] একজন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত নয় । দীর্ঘ দিন ধরে এ নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক ও গবেষণা চলতে থাকে এবং ঐ ধারণাটিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয় । যেমন- জেনেসিস-এ বর্ণিত অনেক সূরারই বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ইত্যাদি । জেনেসিস-এ আক্ষরিক পূনরাবৃত্তির উপস্থিতি ব্যাখ্যা এবং পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর জন্য প্রথম বড় ধরণের প্রচেষ্টা চালান ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী চিকিৎসক ডক্টর জিন এস্ট্রাক (Jean Astruc) । তিনি একটি বিতর্কিত পুস্তিকা লেখেন '*Conjectures on the Original Documents That Moses Appears to Have Used in Composing the Book of Genesis*' মূল দলিলগুলি সম্পর্কে এই অনুসিদ্ধান্ত যে জেনেসিস-গ্রন্থের রচনায় মূসা*(সঃ)*-এর নাম আরোপিত বলে মনে হচ্ছে*]* । পরে এটি দালিলিক প্রকল্প*(Documentary Hypothesis)*' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । কিছুদিনের মধ্যেই একদল জার্মান পন্ডিত এস্ট্রাকের তাত্ত্বিক ধারণাগুলোকে আরো সম্প্রসারিত করে উচ্চতর সমালোচনা *'(Higher Criticism)'* নামে একটি বাইবেলীয় গবেষণা-প্রসূত তাত্ত্বিক মত প্রণয়ন করেন । বহু শাস্ত্রকার-পন্ডিত এসব কাজে জড়িত ছিলেন- আমাদের জন্য অবশ্য এসব বিস্তারিত শাস্ত্রীয় আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক । ইতিহাসের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি হচ্ছে এখানে, বাইবেলের গ্রন্থগুলির অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং লিপিগত বা কর্তৃত্বগত সত্যতা নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন দেখা গিয়েছিল শাস্ত্রকারদের মধ্যে । তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, যীশুর কুমারীগর্ভে জন্মলাভের(অর্থা কোন পিতার ঔরস ব্যাতীত) ধারণাটি মূল গ্রীক রচনার ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল । এই সুযোগেএখানে একথা উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, নবী-রাসুলদের যুগে বংশানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন উপকথাগুলি(Myths) যে ঐশীবাণীর মর্যাদা পেয়েছে, সেগুলো আদতেই এক প্রজন্মের নবীর কাছ থেকে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তির স্মৃতিবাহিত হয়ে পরবর্তী কোন প্রজন্মের নবীর কাছে পৌছেছে তা এখানে প্রমাণিত হচ্ছে ।

৩) **ইতিবৃত্ত**-এমনই পটভূমিতে, Documentary Hypothesis যখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করল, এবং Modernism(আধুনিকতাবাদ) নামে ব্যাপকভাবে আদৃত হলো, প্রটেস্টান্ট রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এটি যেন বোমার বিস্ফোরনের মতই অনুভূত হলো । প্রটেস্টান্ট রক্ষণশীলরা উক্ত মতবাদের বিপক্ষে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালো । আধুনিকতাবাদীদের(Modernist) Higher Criticism-এর প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষশীল প্রটেস্টান্টগণ ১৮৯৭ সালে নায়াগ্রায় ঐতিহাসিক নায়াগ্রা বাইবেল সম্মেলনে(Niagra Bible Conference)-এ মিলিত হলো । যার উদ্দ্যেশ্য ছিল Modernist-দের প্রত্যুত্তরে একটি পাল্টা ধর্মশাস্ত্র দ্বারা শক্তিশালী অবস্থান নেয়া । এই প্রক্রিয়া(অর্থাৎ Higher Criticism-কে ঠেকানোর জন্য নিজেদের রক্ষণশীল শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও তাত্ত্বিক অবস্থানের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি খুজে বের করা এবং তত্ত্ব দাঁড় করানো) ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসবিটারিয়ান চার্চের(Presbyterianism)*[১৪] সাধারণ সভা(General Assembly) পর্যন্ত চলল ।

রক্ষণশিল ঐতিহ্যবাদীরা পাঁচটি মূলনীতি ধার্য করলেন, যেগুলো তাদের যুক্তিতে খ্রীষ্টধর্মকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে । মূলনীতিগুলির আলোচনা এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বলে লেখক মনে করছে । ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে বারটি পুস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো, 'The Fundamentals; A Testimony to the Truth'-এই শিরোনামে । এর মধ্যে ৬৪ জন লেখকের সর্বমোট ৯৪টি আর্টিকেল

সংযোজিত হয়, যেগুলোতে উপরোক্ত পাঁচ মূলনীতির ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও সত্যতা প্রতিপাদন করা হয় । এই পুস্তিকাসিরিজের মাধ্যমে তাকালীন রক্ষণশীল খ্রীষ্টানগণ **'The Fundamentalists'** বলে পরিচিত হলো ।

এখানে আমি পাঠককে স্মরণ করাতে চাই, যে ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ ও সুরজিত দাশগুপ্তের মতে মৌলবাদের জন্ম ফ্রান্সে এধারণা যে ভুল, তা এতক্ষণে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হওয়ার কথা । তবু, আমি খোলাসা করছি । যদি এমন হতো যে, সংস্কারের নামে ক্যালভিনের ছদ্মবেশী মৌলবাদী মতবাদ বা ক্যাল্ভিনিজ্‌ম সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হয়ে সেখানকার মৌলবাদীদের আদর্শিক ও তাত্ত্বিক প্রেরণার উাস হতো, তাহলে ফ্রান্সকেই মৌলবাদের পিতৃভূমি বলা যেত । কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে সেটা বলা যাচ্ছে না কারণ, ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ ও উাসের প্রতিক্রিয়ায় 'The Fundamentals' পুস্তিকাসিরিজের জন্ম সেটা হচ্ছে Documentary Hypothesis, যা জার্মান পন্ডিতরা রচনা করেন ফরাসী চিকিাসক ডক্টর জিন এস্ট্রাকের গবেষণামূলক পুস্তিকার ভিত্তিতে(উপরে বর্ণিত)। কিন্তু এই পুস্তিকার মাধ্যমে এষ্ট্রাক বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে গিয়ে সেসময়ের সাপেক্ষে উদারপন্থী অবস্থান নিয়েছিলেন, যার পরিণতিতে পরে ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিসের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীলরা ফান্ড্যামেন্টাল্‌স গ্রন্থমালা রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় । তাই মোটা অর্থে বা ভৌগোলিক অর্থে ফ্রান্স থেকে মৌলবাদ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে একথা হয়তো বলা যাবে, কিন্তু চুলচেরা ঐতিহাসিক বিচারে তা সঠিক হবে না ।

ধনকুবের তেলব্যবসায়ী মিল্টন ও লিম্যান স্ট্যুয়ার্ট(Lyman Stewart)-এর অর্থায়নে 'দ্য ফান্ড্যামেন্টাল্‌স্'-এর তিন মিলিয়ন কপি মুদ্রিত হলো । ১৯১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব ফান্ড্যামেন্টালিস্ট সম্মেলন । ঠিক একই সময়ে Moody Bible Institute*[১৫] প্রতিষ্ঠিত হলো যার উদ্দ্যেশ্য ছিল 'বাইবেলের পান্ডুলিপিগুলো সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও স্ববিরোধিতামুক্ত'-এই মৌলবাদী মতবাদটিকে জোরালোভাবে সমর্থন ও প্রতিপাদন করে প্রচার-প্রকাশনার কাজ চালানো । উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মৌলবাদী ঈশ্বরতত্ত্ববিদগণ ফান্ড্যামেন্টাল্‌সে(The Fundamentals) বাইবেলের বাণীগুলোর আক্ষরিক অর্থে গ্রহন বা বিশ্বাস করার ব্যাপারে মত দিয়েছেন । এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের উদ্দ্যেশ্য ছিল খ্রীষ্টীয় মৌলবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়া । 'একমাত্র তারাই প্রকৃত খ্রীশ্চিয়ান' - (খ্রীশ্চিয়ান) মৌলবাদীদের এই গোঁড়া বিশ্বাস তাদেরকে অন্যান্য খ্রীশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত সংগ্রামের(খ্রীশ্চান সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত) দিকে নিয়ে গেল,- যখন তারা যতগুলি সম্ভব শাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান(Theological Institutes)এর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগল । যা ছিল তাদের ভাষায় 'Modernist ও Liberal-দেরকে বের করে দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিকে পাপমুক্ত বা শুদ্ধ করা অর্থাা শুদ্ধি অভিযান চালানো' ।

পরবর্তী পর্বের ঘটনাপ্রবাহ উদারপন্থী(Liberal) এবং মুক্তচিন্তার মানুষদের জন্য আরো খারাপের দিকে গেল । ফান্ড্যামেন্টাল্‌স্ গ্রন্থমালার মৌলবাদী ব্যাখ্যা-বক্তব্যের সাথে এবার রক্ষণশীল প্রটেস্টান্টগণ আরো অনেকগুলি নতুন ধারণা বা মতবাদকে বরণ-গ্রহণ করতে বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে এল । সেগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি হচ্ছে-১) একচেটিয়াবাদ-যে মতবাদে দাবী করা হলো যে, একমাত্র ফান্ড্যামেন্টালিস্টদেরই বাইবেলের প্রকৃত ও সত্য অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানে কর্তৃত্ব করার নির্ভরযোগ্য ও বৈধ অধিকার বা যোগ্যতা রয়েছে । অর্থাা তারাই হচ্ছে খাঁটি ও অকৃত্রিম ক্রীশ্চিয়ান । ২) স্বাতন্ত্র্য-এই ধারণার মাধ্যমে দাবী করা হয় যে বাইবেলের অন্যান্য ক্রীশ্চিয়ান (গোষ্ঠীর) ব্যাখ্যা(যেমন, ক্যাথলিক, উদারপন্থী ইত্যাদি) কেবল চরমভাবে ভুলই নয়, বরং তাদের কলুষময় প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে তাদের এসব কাজে (অর্থাা ব্যাখ্যার নামে অবিশ্বাস ছড়ানো) বাধা দেওয়া এবং তাদেরকে পরাস্ত করা মৌলবাদীদের কর্তব্য ।

বাস্তবিকই, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই আজকের যুগে 'মৌলবাদী চার্চের' নির্ধারক চরিত্র হয়ে দাড়িয়েছে ।

The Fundamentals-এ অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলোর ইতিপূর্বে উল্লেখিত বক্তব্য ছাড়াও অন্যান্য রচনাগুলোতে উদারপন্থী ক্রীশ্চানদের Social Gospel(নীচে টীকার স্থলে Gospel[১৬] সম্পর্কে দেখুন)-এর ধারণাকে আক্রমণ করা হয় । যাতে উদারপন্থী ক্রীশ্চানরা এই মর্মে জোরালো মতামত তুলে ধরেন যে, সব মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য ক্রিশ্চিয়ানদের উচিত অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা । ক্রীশ্চান মৌলবাদীরা বরং ধারণাটি এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করে যে, যেহেতু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব আসন্ন, চার্চের একমাত্র কাজ হবে, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বে যে সময়টুকু এখনো আছে তার মধ্যে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব মনুষ্য-আত্মাকে (আধ্যাত্মিকভাবে বা পাপের হাত থেকে) উদ্ধার করা । ক্রীশ্চান মৌলবাদীরা তাদের দৃষ্টিতে 'কাফের (ভিন্নমতাবলম্বী) ও সধর্মত্যাগীদের' সঙ্গে কোন সহযোগিতা বা সংশ্রব রাখতে চাইল না । এটা ছিল মৌলবাদীদের তৃতীয় প্রধান নিশানা, তবে এসব তাপরতা যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আগুন জ্বালালো, তা আজ পর্যন্ত চলছে । যা থেকে আজকের 'সৃষ্টি-তত্ত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত ডিজাইন' আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে-যা ছিল 'বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে জীবের ক্রমবিকাশের(Evolution) প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে টার্গেট করে রাজনৈতিক প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়া ।

চার্লস ডারউইন তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'প্রজাতিবর্গের উাপত্তি প্রসঙ্গে'(On the Origin of Species)- এর প্রথম প্রকাশের পরের বছরগুলোতেই সমালোচনার ঝড়ের সম্মুখীন হলো(এটা য়ুরোপের ঘটনা বলা হচ্ছে-যুক্তরাষ্ট্রের নয়) ধর্মীয় নেতাদের পক্ষ থেকে । যারা 'প্রাণী থেকে মানুষ এসেছে' এই ধারণাকে বাইবেলের উপর সরাসরি আঘাত হিসেবে নিয়েছিল । লক্ষ্যণীয় স্বল্প কালের মধ্যেই, মোটামুটি ১৯০০ সালের মধ্যে, য়ুরোপের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোকে মেনে নিলেন, ঠিক যেভাবে (পূর্বে বর্ণিত) 'ডকুমেন্টারী হাইপেথিসিস'-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে বাইবেলের বিশেষজ্ঞ-পন্ডিতদের সমাধান মেনে নিয়েছিলেন ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন ধরণের । মৌলবাদীরা বিবর্তনবাদ (ক্রমবিকাশ তত্ত্ব) ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তাদের সমস্ত বিদ্বেষপূর্ণ উদ্যম নিয়ে প্রত্যাখ্যান করল, যার লক্ষ্যবস্তু ছিলেন জার্মান বাইবেল বিশেষজ্ঞরা । প্রিন্সটন চার্চের ঈশ্বরতত্ত্ববিদ গ্রেশাম ম্যাচেম ঘোষণা করলেন যে, 'উদারপন্থী আন্দোলনের গোড়া একটাই; নানা কিসিমের আধুনিক উদার ধর্মমতগুলির উাস হচ্ছে ঐ (নষ্টের গোড়া) প্রকৃতিবাদ (Naturalism)*[১৮]-অন্যকথায়, খ্রীষ্টধর্মের উাপত্তির ক্ষেত্রে খোদার সৃষ্টিশীল ক্ষমতা বা কুদরতি মহিমার কোন স্থান নেই, সহজ বাস্তবতা হলো, (সত্য-মিথ্যা যাই হোক) উদারপন্থা কেবল (ধর্মব্যাখ্যা নিয়ে) ভিন্নমতই নয়-খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা থেকে স্বতন্ত্র কিছু বিষয়ে বিচ্যুতিই নয় । বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ ভিন্ন উাস থেকে উদারপন্থার উদ্ভব ঘটেছে.... সৃষ্টিকর্তা, মানুষ, স্রষ্টার(এবং সেই সাথে চার্চীয়) কর্তৃত্বের আসন এবং মোক্ষলাভের পথ সম্পর্কিত উদারপন্থী দৃষ্টভঙ্গি বা মতবাদ খ্রীষ্টধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।.....খ্রীষ্টধর্ম ভেতর থেকেই আক্রান্ত হচ্ছে এমন একটি আন্দোলন দ্বারা যেটি মর্মবস্তুর দিক থেকেই ক্রীশ্চিয়ানবিরোধী '। মৌলবাদী ধর্মীয় সংগঠনগুলি রক্ষণশীল আইনপ্রণেতাদের নিয়ে মৈত্রী ফ্রন্ট স্থাপন করল কংগ্রেসে 'বানর আইন' পাশ করার লক্ষ্যে-এই আইনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক রাজ্যে বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেওয়া বেআইনী করা হলো । বিভিন্ন রাজ্যে এনিয়ে যতগুলি আইন প্রণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি ছিল ১৯২৫ সালে টিনেসী রাজ্য বিধান সভায় প্রণিত বাটলার এক্ট । মার্কিন সিভিল লিবার্টজ ইউনিয়ন(Civil Liberties Union) টেনেসি রাজ্যের

নতুন আইনের(যার মাধ্যমে বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেওয়ার মৌলিক নাগরিক, মানবিক ও বিবেকের অধিকার লঙ্ঘন করে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে) সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিল । তারা ঘোষণা করল যে, যে কোন শিক্ষকই ইচ্ছাপূর্বক এই আইন লঙ্ঘন করবেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা তাকে প্রয়োজনীয় সমর্থন দেবেন । টিনেসীর ডেটনে জীববিদ্যার শিক্ষক জন টি স্কোপ্‌স্‌ এব্যাপারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেন কালো আইন লঙ্ঘন করে মামলার মাধ্যমে একে চ্যালেঞ্জ করতে । যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বিখ্যাত টিনেসি আদালতের এই বিচারে(যা 'Scopes Trial' হিসেবে খ্যাত)কোর্টে শত শত সাংবাদিক, বাল্টিমোর রেডিওর খ্যাতিমান রিপোর্টার এইচ এল মেনকেন প্রমুখ আদালতে উপস্থিত ছিলেন । ফটোগ্রাফারদেরকে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হলো । বানর আইন লঙ্ঘনের জন্য মিস্টার স্কোপ্‌স্‌ এবং সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন পরাজিত হয়, যার মূল কারণ ছিল জুরিদের মধ্যে রক্ষণশীলদের সংখ্যাধিক্যতা । আইনগত জটিলতার কারণে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করার সুযোগ হলোনা ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রভাবশালী আইনজ্ঞদের সহায়তায় মৌলবাদীরা মামলায় জিতে গেলেও, সেটা তাদের জন্য হিতে বিপরীত হয়েছিল । কারণ, জুরিদের জেরার সময়, বাইবেলে বর্ণিত যে সৃষ্টি-তত্ত্বের ভিত্তিতে মৌলবাদী আইনবিদরা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদ পরিহার করে নিছক ধর্মবিশ্বাসের নামে বিজ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছেন, সেটি রেডিও-টেলিভিশনে দেশব্যাপি মানুষ সচক্ষে দেখতে পেল । সাংস্কৃতিকভাবে মিডিয়াযুদ্ধটি ছিল মৌলবাদের জন্য একটা বিধ্বস্তকর পরাজয় । অনতিকাল পরেই এই রাজনৈতিক ও আইনগত বিজয় তাদের জন্য দুর্দশা বয়ে আনল । প্রখ্যাত রিপোর্টার-কলামিষ্ট মেনকেন ও অন্যান্য কলামিষ্টদের লেখা শ্লেষাত্নক আর্টিকেল এবং সিনক্লেয়ার ল্যুইস ও এলমার গ্যান্ট্রির মতো ঔপন্যাসিকগণ মৌলবাদীদেরকে অশিক্ষিত ও জঙ্গল থেকে আগত (সূক্ষ্মচিন্তা বিবর্জিত) অমার্জিত গেঁয়োরুপে চিত্রিত করলেন । বানর আইনের মাধ্যমে মৌলবাদীদের রাজনৈতিক বিজয়ের মৃত্যু ঘটল কয়েক বছরের মধ্যেই । ধর্মশাস্ত্রীয় কলেজ ও ইন্‌স্টিট্যুটগুলোর(যেমন-আমাদের মাদ্রাসা) মধ্যে মৌলবাদী ও উদারপন্থী বা Modernist-এর মধ্যে অন্তর্কলহের কারণে চার্চসদস্যপদ ও যাজক-তৈরীর প্রশিক্ষণে ছাত্রের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পেল । ১৯২৯ সালের মহামন্দার সময় যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মৌলবাদ প্রায় মৃত বা অকেজো হয়ে গেল ।

গ) প্রিয় পাঠক, মৌলবাদের সঙ্গে ভাইরাসের তুলনা করা যেতে পারে । 'ইসলাম ও শরীয়া' গ্রন্থের লেখক হাসাম মাহ্‌মুদ তাঁর ওয়েবসাইট banglarislam.com-এ একটি আর্টিকেলে সাম্প্রদায়িকতাকে ভাইরাসের সাথে তুলনা করেছেন । তিনি লিখেছেন, 'যে ভাইরাস হচ্ছে এমন একটি জটিল রাসায়নিক যৌগ(এব্যাপারে আমার সামান্য দ্বিমত আছে-ঠিক জড় বা রাসায়নিক যৌগ না বলে, একে জড় ও জীবের মাঝামাঝি একধরণের অণুজীব বা Microorganism বলাই যুক্তিযুক্ত) যা যুগ যুগ ধরে এর সমস্ত ক্ষতিকারক গুণগুলি নিয়ে মৃতবৎ পড়ে থাকতে পারে । যে মূহুর্তে এটি কোন প্রাণীদেহ বা এর অভ্যন্তরস্থ জীবকোষের সংস্পর্শে আসে, তখনই এটি তার সবগুলো নিষ্ঠুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে উঠে' । অর্থা, ভাইরাস কোন জীবদেহে পরজীবি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে, যতক্ষণ খাদ্য ও পানীয় অর্থা পুষ্টি সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়, ততক্ষণ এটা মৃতব পড়ে থাকে, কিন্তু, যখনই উপযুক্ত কোন পরিবেশ(যেমন-নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, পরজীবি হয়ে অন্য প্রাণী বা মানুষের দেহে প্রবেশ করার পর) এবং পুষ্টিগ্রহণের সুযোগ পায়, তখনই বেঁচে উঠে এবং বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে । তবে, এটা তো গেল বেঁচে ওঠার ক্ষেত্রে । কিন্তু, এদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য যে সামাজিক পদার্থবিদ্যার কিভাবে কাজ করে সেব্যাপারে এই লেখকের একটি

সূত্র রয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, সোভিয়েত-মার্কিন ঠান্ডাযুদ্ধের পটভূমিতে, (ভাইরাসের মত বহুকাল মৃত থাকার পর) যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীশ্চান মৌলবাদীরা তাদের ভাগ্য ফেরানোর সুযোগ পেল । তাঁকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে আসীন নাস্তিক্যবাদী লেনিনপন্থী নেতৃত্ব ছিল তাদের সুবিধাজনক শত্রু । সেসময় মৌলবাদীরা দ্রুততার সাথে নেতৃস্থানীয় ডানপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মৈত্রী স্থাপন করল, ভাইরাস যেমন করে পরজীবি হিসেবে অন্য জীবদেহে আশ্রয় নেয় । যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাককার্থিজ্‌মের*[১৯] প্রাদুর্ভাবের যুগে, সময়টা ছিল মৌলবাদী ধর্মতত্ত্ব বিকশিত হওয়ার উর্বর উর্বর ক্ষেত্র । এমন সুবর্ণ সুযোগ ও অনুকুল পরিস্থিতি তাদের (মৌলবাদী ভাইরাসের) জন্য রাজনৈতিক প্রভাবপত্তি প্রসারের উপায় নিয়ে এল, যা তারা বহু যুগ উপভোগ করেনি ।

১৯২০ সালের মৌলবাদী আন্দোলনের মতোই, এটা ছিল সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া । ষাটের দশকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক বিবর্তনের গতিধারা অত্যন্ত তীব্র হলো । দশ বছরের মধ্যেই একটি নব্য প্রজন্ম মার্কিন গতানুগতিক সামাজিক কাঠামোকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করল । নাগরিক অধিকার আন্দোলন ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ভূমিকা ও প্রভাব নষ্ট করে ফেলল । যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ও নাগরিক অধিকার আন্দোলন দেশপ্রেমের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এল এবং বিশ্বব্যাপী মার্কিন ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে ফেলল । অংশীদারত্বভিত্তিক গনতন্ত্রের(Participatory democracy) দাবীতে পরিচালিত আন্দোলন গতানুগতিক রাজনৈতিক এষ্টাব্লিশমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করল । নারীমুক্তি আন্দোলন ও সমকামী অধিকার আন্দোলন প্রচলিত পরিবার-কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করল ।

এমনই একটি পটভূমিতে, মৌলবাদীদের শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু হলো নাগরিক অধিকারসংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের কিছু সিদ্ধান্ত বা রায় । তার মধ্যে একটি ছিল ১৯৫৪ সালের 'ব্রাউন ভি ইডুকেশন বোর্ড ' সংক্রান্ত রায় যাতে 'Segregated'*[২০] স্কুলগুলিকে আইন-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল । যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের রাজ্যগুলির মৌলবাদীরা সেগ্রিগেশনকে বাইবেল-অনুমোদিত বলে গণ্য করত । তারা **Desegr egat i on**-এর প্রক্রিয়া ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিক্ত সংঘাতে লিপ্ত হলো ।

১৯৫৪ সালের কোর্ট ডিসিশনের প্রতিক্রিয়ায় বহু মৌলবাদী চার্চ তাদের নিজস্ব প্রাইভেট স্কুল প্রতিষ্ঠা করল, যেগুলি কোর্টের রায়ের আওতার বাইরে ছিল । এতে তারা তাদের বর্ণবৈষম্যমূলক সেগ্রিগেশন নীতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে পেরেছিল, যাতে করে ঐসব স্কুলগুলিতে কালোদের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারতো না । এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্যসমাজে অনুসৃত ব্রাহ্মণদের বেদচর্চা, ব্রহ্মসাধনা ও বিদ্যাচর্চা প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকারের কথা বেশ প্রাসঙ্গিক । ১৯৬১ সালের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় ছিল মৌলবাদীদের জন্য আরেকটি বড় ধরণের আঘাত । রায়ে স্কুলগুলোতে ধর্মীয় প্রার্থনার জন্য সরকারী প্রশাসনের অনুমোদন দেয়া বেআইনী বলে ঘোষিত হলো । রায়ে বলা হয়েছে,"We think that, in this country, it is no part of the business of government to compose official prayers for any group of the American people to recite as a part of a religious program carried on by government." (US Supreme Court, Engel v Vitale, 1961) এই রায় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীদের জন্য একটি বড় ধরণের বিজয় । এই আইনী সুরক্ষার ফলে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা হলো 'Wall of separation'-এর নীতি অনুসরণ করে । ফলশ্রুতিতে বহুত্ববাদী ধর্মীয় সংস্কৃতির আবহ মৌলবাদীদের বাধ্য করল এই বাস্তবতার সাথে মানিয়ে চলতে ।

১৯৬১ সালে *Epperson v Arkansas* মামলায় কোর্ট রায় দিল যে বিভিন্ন রাজ্যে

প্রচলিত বিবর্তনবাদবিরোধী 'বানর আইন' সংবিধান পরিপন্থী । উপরোক্ত পরাজয়গুলির প্রতিক্রিয়ায় ক্রীশ্চান মৌলবাদীরা সেই ১৯২০ সালের অভিজ্ঞতায় ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য আদাজল খেয়ে লাগল । .....পরবর্তী এক দশকের মধ্যে মৌলবাদীরা অনেকগুলি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করল যেগুলির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, নির্বাচনে ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের ব্যবহার, সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নজিরবিহীন রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করল । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৭৯ গঠিত জাতীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠন মোরাল মেজরিটি ইন্‌ক্‌ । এই প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁরা বুশের শাসনকাল পর্যন্ত প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে ।

৪. ক) আধুনিইক ইসলামী মৌলবাদের আদিগুরু ছিলেন ইবনে তায়মিঞা (১২৬৩-১৩২৮)*[২১] ।

তিনি যে সময়ের মানুষ ছিলেন তখন মুসলিম দেশগুলো বহিঃশক্তির আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল । তাঁর সময় ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একদিকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য মোঙ্গল বাহিনীর কাছে পরাজিত ও অধিকৃত হয়, অন্যদিকে পবিত্র ভূমি হিসেবে মুসলিমদের কাছে সমাদৃত জেরুজালেম য়ুরোপের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের ক্রুসেডারদের দ্বারা অধিকৃত হয় । আবার এদিকে মোঙ্গলরা মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই ধ্বংস করেছিল যখন সিরিয়ায় মোঙ্গলদের কাছে মুসলিম শক্তির পতন ঘটে । এমনই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, (যখন মুসলিম রাজ্যগুলিতে অস্থিরতা-অবক্ষয় ও নৈরাজ্য চলছিল) তখন এর কারণ হিসেবে তায়মিঞা দেখলেন যে মুসলমানরা ধর্মীয় রীতিনীতি, কঠোর শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তীতা হারিয়ে নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে । তাঁর মতে, তখনকার মুসলিম নেতারা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী , যারা জনগণকে সঠিক বিশ্বাস ও ধর্মাচার পালনের দিকে উ□সাহিত করেনি । সেসময় মোঙ্গলরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হলেও তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল মূলত মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে । তায়মিঞার মতে, কেবল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কেউ মুসলমান হলেই সত্যিকার মুসলিম হয় না । সত্যিকার মুসলিম হতে হলে শরিয়াকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে । এর পেছনে পটভূমিটা ছিল, ধর্মান্তরিত হলেও গেংগিস খান প্রবর্তিত পুরনো(ধর্মান্তরিত হওয়ার আগের) যাসা বিধান(Yasa Code)-এর দিকে মোঙ্গলদের তখনও ঝোঁক রয়ে গিয়েছিল । এর ফলশ্রুতিতে তায়মিয়া তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন এবং এভাবে একটি নূতন নজীর সূচনা ঘটালেন 'তথাকথিত 'খোদার প্রতিনিধিত্বকারীদেরকে'(খেলাফত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তাদের সমর্থনকারী আলেমদেরকে) হিংসাত্মক বিদ্রোহের মাধ্যমে অপসারণ করার যোগ্য' বলে প্রচার করার মাধ্যমে ।

খ) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্দুল ওয়াহাবের(১৭০৩-১৭৯২) নেতৃত্বে সালাফি*[২২] আন্দোলনের মাধ্যমে তায়মিয়ার দর্শন পুনরুজ্জীবন লাভ করে । সালাফি মতে, প্রথম তিন প্রজন্মের মুসলিমরা অর্থা□, মুহম্মদ(সঃ)এর সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানেরাই ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝেছে এবং অনুসরণ করেছে । য়ুরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রতি সালাফি আন্দোলনের সমীহ ছিল । এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা মুসলমানদের কল্পিত স্বর্ণযুগকে পুনরুজ্জীবিত করার স্বপ্ন দেখেছিল । কিন্তু,আব্দুল ওয়াহাব মূল সালাফি দর্শন থেকে সরে আসেন । তিনি দাবী করেন যে মুসলিম বিশ্বের অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যের নব নব বিপ্লব ও পরিবতনের জোয়ার, যেমন-য়ুরোপীয় আধুনিকতাবাদ । মোটকথা হাদীস বা কোরাণের যেকোন যুগোপযুগী পরিবর্তন বা সংশোধনকে তারা বিদাহ্‌(বাংলায় 'বেদায়াত') বলে রায় দিয়েছিল এবং প্রথাগত ইসলামের অনেক

উপাদানকেও । তিনি মুসলিমদের অনেক আচার-প্রথাকে শেরেক হিসেবে চিহ্নিত ও অভিযুক্ত করেন । ওয়াহাবীরা নিজেদেরকে মুজাহিদীন(একত্ববাদী) বলে ঘোষণা করল । কিন্ত এর ফলে প্রথাগত ইসলামের আচার-প্রথা, স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতির সাথে ওয়াহাবী উগ্র ইসলামের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় দেশে দেশে-যেমন ইরানের শিয়াদের নিজস্ব কিছু প্রথা ও সংস্কৃতি বহু যুগ পূর্ব থকেই ছিল । বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য-দর্শন ও সংস্কৃতির সাথে আদান-প্রদানের যে ইচ্ছানিরপেক্ষ বাস্তবতা, এবং খাপ খাওয়ানোর বিচক্ষণ নীতি এভাবে উপেক্ষিত হয়, যার নজীর আমরা ভারতবর্ষে ইসলামের বিস্তারলাভের সময় দেখতে পাই । কোন কোন গবেষকের মতে সঊদি আরবকে ওয়াহাবী মতবাদ রপ্তানীর জন্য সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা প্যান ইসলামী সালাফি মতবাদের রপ্তানি ঘটিয়েছে । সৌদি আরব বেশকিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন দেশে(অন্তর্জাতীয় বা আন্তঃদেশীয়) কাজ করার জন্য যেগুলোর হেডকোয়ার্টার সৌদি আরবে অবস্থিত । এসব সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুপরিচিত হলো বিশ্ব মুসলিম লীগ যা ১৯৬২ সালে মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রতিষ্ঠানটি সাঈদ কুতুব ও হাসান আল বান্নার নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশে পুস্তক ও ক্যাসেট সরবরাহ ও বিতরনের ব্যবস্থা করতে থাকে । সৌদি আরবের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাদের এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ।

গ) **পারিবারিক সাদৃশ্যতা** --ক) 'ইসলামী মৌলবাদ' পরিভাষাটির উদ্ভাবক হচ্ছেন সুপরিচিত প্রাচ্যবিদ এইচ এ আর গিব । যিনি তাঁর Mohammedanism (পরে 'ইসলাম' নামকরন করা হয়) গ্রন্থে প্যান ইসলামিক(ইসলামী উম্মা) সংস্কারক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিত জামাল আল দীন আল আফগানীর(১৮৩৮-১৮৯৭)*[২৩] প্রসঙ্গ তুলে ধরেন । তিনি ছিলেন উনিশ শতাব্দীতে পারস্য, মিশর এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মুসলিম আধুনিকতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা, দার্শনিক ও রাজনৈতিক কর্মী, যিনি বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শোষন এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ব-মুসলিমের ঐক্যের(প্যান ইসলামিজ্‌ম) প্রয়োজনীয়তার প্রবক্তা । পশ্চিমা আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সংগঠিত করার রণকৌশলের ক্ষেত্রে তিনি শাস্ত্রীয় পন্থায়(ফিকাহ্-সুন্নাহ-শরীয়া ইত্যাদি) জোর দেওয়ার ব্যাপেরে কমই আগ্রহী ছিলেন । মুসলিম সংহতির জন্য তাঁর আহ্বান মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, 'তাঞ্জিমাত' নামে খ্যাত তুরস্কের সংস্কার আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল । পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ(যেমন-ম্যালিস রুথভেন) আফগানীকে মৌলবাদী বলেছেন এই জন্য যে, তিনি (রুথভেনের ভাষায়) ষড়যন্ত্রের পরিকল্পক এবং প্রথম যুগের ইসলামে ফিরতে চেয়েছিলেন । রুথভেনের এই দাবীর পক্ষে অন্য ঐতিহাসিকদের সমর্থন পাওয়া যায়না । এখানে দুটো পয়েন্ট আসছে-এক,শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটি যে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে আঘাত করেছিল পাঠক তা দেখেছেন । রুথভেন সাহেবের আফগানীকে মৌলবাদী বলার এটা একটা কারণ হতে পারে । দুই, যেখানে আফগানীর সময় 'মৌলবাদ' পরিভাষাটিরই জন্ম হয়নি, তিনি কিভাবে আফগানীকে মৌলবাদী আখ্যা দিতে পারেন ? আমরা সবাই জানি যে ১৮৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নায়াগ্রা সম্মেলনের মাধ্যমে মৌলবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে । কিন্তু, হোয়াইট হাউসের আশীর্বাদপ্রাপ্ত বিশ্লেষকরা সেটি গোপন করতে চান । এভাবে ধরলে তো মার্টিন লুথার এবং জন ক্যাল্ভিনকে যে অনেকে বিশ্ব মৌলবাদের আদিপিতা বলতে হয়-যা অনেকেই বলে থাকেন । এগুলো নিরপেক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠতা থেকে করা হয়না-অনেকটা ভাবাবেগ থেকে করা হয়ে থাকে । আসলে তায়মিঞার পর পর ইবনে ওয়াহাব প্রমুখরাই ইসলামী মৌলবাদকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার আন্দোলনের সূচনা ঘটান ।

আল-আফগানী ১৮৭৯ সালে অটোমান সুলতান আব্দুল আজিজের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং

তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । (কোন কোন ঐতিহাসিকের ভাষ্য) বলা হয়ে থাকে যে, অটোমান সুলতান আফগানীর তাত্ত্বিক আদর্শ ও স্বপ্নকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । তুরস্কের রাজকর্মচারীরা,- যারা তখন 'তাঞ্জিমাত সংস্কার'-এ নিমগ্ন হয়েছিল, আল-আফগানী্কে তেমন গুরুত্ব দিলনা । তিনি সেখানে শিক্ষা পরিষদের একজন কর্মচারী নিযুক্ত হন । শিক্ষা কাউন্সিলকে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারের ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করেন, যেখানে তিনি অনেকগুলো উদ্দীপনাময় সংস্কারবিষয়ক লেকচার দেন । লেকচারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, সেই লক্ষ্যে ইসলামী সমাজকে আধুনিকীকরণের আবশ্যকতা এবং শিয়া যুক্তিবাদী দর্শন । ইসলামী সমাজকে আধুনিক করার পক্ষে তাঁর ভাবাদর্শ এবং শিয়া যুক্তিবাদ ইস্তাম্বুলের রক্ষণশীল সুন্নী মোল্লা সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল ।

১৮৮৪ সালে আফগানি প্যারিসে একটি শক্তিশালী লিঁয়াজো-মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর শিষ্য মুহম্মদ আবদুহ্‌কে নিয়ে-পাশ্চাত্য পন্ডিতদের ভাষায় সেটি ছিল তাঁর সময়ের নেতৃস্থানীয় 'সংস্কারবাদী জার্নাল'(হিউম্যানিষ্টদের ভাষায়, মৌলবাদী জার্নাল) । উক্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা এবং মুসলিম দেশগুলির কর্ণধার ও মুসলিমদের বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান জানানো হতো । আফগানী যুক্তি দেন যে, এভাবেই মুসলমান সমাজ য়ুরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে তাদের পুরনো ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে । তিনি আরো মত দিয়েছিলেন যে, ইরান অবশ্যই সংবিধান ও পার্লামেন্টের মাধ্যমে শাসিত হওয়া উচিত যেখানে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে । তবে এব্যাপারে মতভেদ বা বিতর্ক রয়েছে । কারণ, তাঁর একজন জীবনীকারের*[২৪] মতে, যদিও তাঁর প্রশংসাকারী একজন সমসাময়িক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক তাঁকে লিবারেল হিসেবে চিহ্নিত করেন, প্যারিস থেকে প্রকাশিত তাঁর পরিচালিত সংবাদপত্রের তাত্ত্বিক প্রবন্ধগুলোতে এমন কোন ভাষ্য পাওয়া যায়নি যা রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে যায় । বলাই বাহুল্য, যে এটা তখনকার সময়ের জন্য ছিল একটা ইয়োটোপীয় চিন্তাধারা । প্যান ইসলামিজ্‌মের ধারণার সাথে স্থানীয় শাসক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের দ্বন্দ্বের স্বরুপটি সেযুগে তাঁর জন্য বোঝা সম্ভব ছিলনা । তিনি মুসলমানদের ঐক্যের কথা বললেও একজন খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ধারণা সমর্থন করেননি । বরং য়ুরোপীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইসলাম ধর্মকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে খাপ খাওয়ানো সম্ভব, এবং নিজেদের বিশ্বাসের ভিন্নতা বজায় রেখেও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে । ঐক্যের রুপটি কেমন হবে, রাষ্ট্রের কাঠামো বা রুপটি কেমন হবে সেসম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা তাঁর ছিল বলে মনে হয় না । শুধু তাই নয়, ঐক্যের পন্থা হিসেবে ভোটের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের অথবা আবর্তন পদ্ধতির মাধ্যমে(Alternating) খলীফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সব পক্ষকে খুশী করার পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন কিনা সেব্যাপারে জানা যায়না । ধর্মীয় পদবীর ভিত্তিতে তিনি যে আলেম-শাসিত (খেলাফতী ব্যবস্থার অনুরুপ) 'ধার্মিক ও পূণ্যশীল শহর'-এর কল্পনা করেছিলেন, তার সাথে মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারটি একটি গোঁজামিল বা ইয়োটোপিয়া বলেই মনে হয় । কারণ, রাষ্ট্রের শাসনকাঠামো বা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর উপর যে বিভিন্ন মুসলিম দেশ বা রাজ্যগুলির শাসক শ্রেণীর কায়েমীস্বার্থের, ক্ষমতাভাগাভাগির এবং অবস্থান ও প্রভাবপ্রতিপত্তির প্রশ্নটি জড়িত ছিল এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান তখনকার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের যুগে তাঁর ঐ ভাবধারা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল সেটা তিনি বুঝতেন বলে মনে হয়না ।

প্রিয় পাঠক, বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, রক্ষণশীল মোল্লাদের এই ধরনের পশ্চাদ্‌পদ ভূমিকার কারণে মুসলিম দেশগুলি জ্ঞানবিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়েছিল, যার কারণে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের

লুণ্ঠনের স্বীকার হয় । যাই হোক, তুরস্কের সুন্নী কট্টরপন্থী মোল্লারা তাঁকে কাফের ফতোয়া দেয় । পক্ষান্তরে তিনি সুন্নী মৌলবীদের খোদা সম্পর্কিত ধারণাকে একজন অশিক্ষিত কারিগরের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করেন । ওলামাদের সাথে আফগানীর দ্বন্দ্ব চরমে উঠলে (ক্ষমতার স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের জন্য) সুলতান আব্দুল আজিজের জন্য তার ভারবহন করা কঠিন হয়ে পড়ল । এ থেকে বোঝা যায় সেযুগের মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে বিদ্যমান পারিপার্শ্বকতার সাপেক্ষে তিনি যথেষ্ঠ অগ্রসর চিন্তার মানুষ ছিলেন ।

যেহেতু এসবের পরেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা তাঁকে 'ইসলামী মৌলবাদের জনক' আখ্যা দেওয়া যে রাজনৈতিক বিবেচনা করা হয় তা অনুমান করা যায় ।

১৮৯২ সালে আফগানী ইরানের শাহ্ নাসির আল-দীন কর্তৃক আমন্ত্রিত হন সরকারী কাজে বিজ্ঞ পরামর্শ দেয়ার জন্য । যখন ইরানে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, (রাষ্ট্রের শাসনকাঠামোর অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের কারণে) ইরান শিঘ্রই ব্রিটিশদের কাছে শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পন করতে যাচ্ছে । তিনি তখন দাবী তোলেন যে ইরানের রাজস্ব শাহের য়ুরোপে প্রমোদ-ভ্রমনে ব্যায়ের পরিবর্তে রেলরোড নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতিতে ব্যয় করা হোক । তিনি মত দেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধ করতে হলে ইরানের একটি টেকসই ও যুগোপযোগী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন । শাহের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে শাহের কায়েমী স্বার্থ ও তার ব্রিটিশ-নীতির

কারণে । এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে তিনি কারারুদ্ধ হন ও পরে ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে অটোমান মেসোপটেমিয়ায় নীত হন । পরে তিনি শাহ্‌কে অভিযুক্ত করেছিলেন য়ুরোপীয়ানদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে মুসলমানদেরকে দুর্বল করার জন্য এবং এইরুপে রাজস্বের অপব্যয় করার জন্য । শাহের ব্রিটিশ-আনুকূল্যের প্রতি তাঁর এই বিক্ষোভ ও তীব্র সমালোচনাকে, ১৮৯১ সালে শাহের বিরুদ্ধে যে সফল বিদ্রোহ সংগঠিত হয় তার আদি-উ□স হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে । এই বিদ্রোহের কারণ ছিল ব্রিটিশ কোম্পানীর একচেটিয়া পূজির কাছে আত্মসমর্পন করে একচেটিয়াভাবে টোবাকো মঞ্জুর*[২৫] করা । এই বিদ্রোহের পরিণতিতে ১৯০৫ সালে ইরানে সাংবিধানিক বিপ্লব সংঘটিত হয় ।

বিশ্লেষণ- ইবনে হানবাল, ইবনে তাঈমিঞাএবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারক ও ভারত উপমহাদেশে বিস্তৃত বর্তমান মৌদুদীবাদ(মৌলবাদ)এর পথিকৃ□ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এবং তাদের ঐতিহ্য অনুসারী ইবনে সউদের যোদ্ধাদেরকে আমরা মৌলবাদীরুপে চিহ্নিত করতে পারি, সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ইসলামের 'মূল শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে'(অর্থা□, কোরাণ-হাদীসের বিধানগুলির আক্ষরিক ও সাহাবীদের সময়কার আরব্যসমাজে প্রচলিত ব্যাখ্যাকে চালু বা প্রয়োগ করা; পন্ডিত লরেন্স প্রদত্ত সংজ্ঞা দেখুন) তাদের ফেরার প্রচেষ্টা জন্য । কারণ, তাদের ধারণায় বিগত কয়েক শতাব্দীর সঞ্চিত রীতি-প্রথা, শিক্ষা ও ঐতিহ্য (তাদের ধারণায়)যার অভাব পূরণ করতে পারেনি । আরেকটি প্রপঞ্চ এখানে লক্ষ্যণীয়-সেটা হচ্ছে, 'পারিবারিক সাদৃশ্যতা'; আমি আমার অন্য একটি প্রবন্ধে('চিরকালীন মোল্লা-পুরোহিততন্ত্র বনাম নারীর ক্ষমতায়ন, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি') দেখিয়েছিলাম যে, মৌলবাদীরা সমাজবিবর্তনের ইচ্ছানিরপেক্ষ ধারাবাহিকতা ও এর অভন্তরস্থ সাংস্কৃতিক বহমানতাকে হয় বুঝতে পারেনা অথবা মেনে নিতে পারেনা । এখানে প্রসঙ্গটা এসেছে এই জন্য যে তাদের এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দেশের বা মহাদেশের মৌলবাদীদের 'পারিবারিক সাদৃশ্যতা'-র লক্ষণকে তুলে ধরছে যা উইটজেন্‌ষ্টাইন ইতিপূর্বে দেখিয়েছেন । ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে-এটা একটা ভাববাদী ধারণা, যা মনীষী কার্ল মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদে এবং পরে মহামতি লেনিন অসার ও ভিত্তিহীন বলে প্রতিপাদন করেন । এই ধারণায় সমাজের বিভিন্ন উপাদান,

বস্তুগত শর্ত, বিদ্যমান সামাজিক বর্গ ও শ্রেণীসমূহকে কাদামাটির মতো 'Flexible' বলে ধরে নেয়া হয় ।

রুথভেনের মতে, আফগানীদের সূচিত সালাফিয়া' আন্দোলন, যার ভাবাদর্শটি ছিল একই সাথে এনলাইটেনমেন্ট এবং মহানবীর পূণ্যবান সাহাবীদের স্বর্ণযুগে ফেরার স্বপ্নবিলাস, তা শেষ পর্যন্ত একটি পর্যায়ে গিয়ে তার আধুনিকতাবাদের চেতনাকে আত্মসা করল । যখন মোহাম্মদ আবদুহ্ আফগানীর সঙ্গ ত্যাগ করে মিশরের ব্রিটিশ শক্তির সাথে হাত মেলালো তথাকথিত সংস্কারবাদী এজেন্ডাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশায় ।

৫. ইবনে তায়মিয়া এবং আব্দুল ওয়াহাবের পরে ইসলামী মৌলবাদের পথিকৃৎ ছিলেন মূলত দুজন-মিশরের হাসান আল বান্না এবং পাকিস্তানের মৌদুদীর গুরু সৈয়দ(বা সাঈদ) কুতুব ।

সাঈদ কুতুবের উত্থাণের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে স্কটিশ ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার এবং ক্যালিফোর্নিয়া য়ুনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ এন্ড কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন-এর প্রাক্তন প্রফেসর ম্যালিস রুথভেন লিখেছেন, যে ইসরাইলের প্রতি পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার ভাষায় 'মিশরের একনায়ক'(এবং অবশ্যই আমাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতিয়তাবাদী নেতা) গামাল আব্দুল নাসের কর্তৃক মৌলবাদী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর দমন-পীড়নের ফলশ্রুতিতে যে বিক্ষোভের জন্ম নেয়, সেটাই তার ভাষায় 'ইসলামী তাত্ত্বিক'(?) সাঈদ কুতুবের লেখনীর জন্য জ্বালানীর কাজ করে । অবশ্য, বলতেই হবে যে, এটা তাঁর ব্যাক্তগত ধারণা । তিনি যখন গামাল আব্দুল নাসেরকে একনায়ক আখ্যায়িত করেন, তখন তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । কি পটভূমিতে নাসের ক্ষমতা নিয়েছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোন গণতান্ত্রিক শাসককেই যে টিকতে দেয়নি সেসব ইতিহাস এখানে টানতে চাইনা । তবে নাসেরকে পশ্চিমারা একনায়ক বলার মূল কারণ যে তাঁর তেলসম্পদ জাতীয়করণের ফলে ইঙ্গ-মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলির স্বার্থহানি ও খবরদারির অবসান, সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেওয়া(যা রুথভেন সাহেব উল্লেখ করেননি) ইত্যাদি, সেটা বোধগম্য । শুধু তাই নয়, তার প্রতি এই সহানুভূতি এবং তাকে মহিমান্বিত করার এই প্রচেষ্টা থেকে সাঈদ কুতুবের মত মৌলবাদী ক্যারিশ্‌মেটিক নেতাদের প্রতি এবং সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যে মৌলবাদী উত্থাণের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের লেলিয়ে দেওয়া বুদ্ধিজীবিদের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ও নৈতিক প্রচার ও অনুপ্রেরণা যে কাজ করেছে এট বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে । যাই হোক, রুথভেন সাহেবের মারফত আমরা জানতে পাচ্ছি যে, ১৯৬৬ সালে সাঈদ কুতুবকে নাসেরের পুলিশ কারাগারের নিক্ষেপ করে এবং দন্ডিত করে সরকারবিরোধী সন্ত্রাসী কাজের জন্য, যেমন করে আমাদের দেশের জঙীরা সাধারণ মানুষ হত্যা করেছিল ইসলামের নামে । তবে পার্থক্য হচ্ছে এই, যে পাশ্চাত্যের প্রচারের কল্যাণে সাঈদ কুতুবকে বিখ্যাত করে তোলা হয় । ওই দন্ডের পরেই নাকি কুতুব সিদ্ধান্তে পোঁছেন যে, আরব বিশ্বের মুসলিম সমাজ আর ইসলামিক নেই । তারা আবার আরবের সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের পাপ-অজ্ঞতা-অধর্ম ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতিতে পতিত হয়েছে । কুতুব তার লেখায় যুক্তি দিয়েছেন যে, খোদা যেভাবে মুহম্মদকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন (দিয়েছিলেন কি ? দেখুন টীকা-ভাষ্য *[২৬]), যে মক্কার প্যাগানরা(পোত্তলিকরা) ইসলামের কাছে চূড়ান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, ঠিক তেমনিভাবে, একইভাবে তার ও তার সুযোগ্য অনুসারীদের(অর্থা জঙ্গীদের) উপর দায়িত্ব বর্তে গেছে আরবের নামে মুসলমান সরকারগুলোর উপর এবং পাশ্চাত্যের ব্যাক্তিবর্গ ও পর্যটকদের উপর হামলা চালানো । কত বড় মিথ্যাচার এটা । ইসলামকে কতটা নীচে নামানো হয়েছে, পাঠক একবার

ভেবে দেখুন । আমরা ভাল করেই জানি, রসুল্লাহ্ তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার করতে চাননি । তিনি পৌত্তলিক উপাসকদেরকে বুঝিয়েছেন, ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, সেজন্য নির্যাতনও সহ্য করেছেন । তিনি তখনই যুদ্ধ করেছেন, যখন নব্য মুসলিমরা আক্রান্ত হয়েছিলেন অথবা আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল অথবা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নব্য মুসলিমদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল । আর, ইসলাম কি এতই ঠুনকো যে, বলপুর্বক ও হিংসাত্মক উপায়ে পৌত্তলিকদের উপর চাপিয়ে দিতে হবে ? কিন্তু, কুতুবের ভাষায় সেই শক্তির ভাষা ও নিষ্ঠুরতার সাফাই-ই প্রতিফলিত হচ্ছে-কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি সবচেয়ে জঘন্য যে অন্যায় ও মিথ্যাচারটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা হলো রসুলুল্লাহ্র প্রতি 'ধর্মান্তরিত করার জন্য উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসের পথ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামের সূচনাতেই নজীর সৃষ্টির' জন্য দোষারোপ করে । এভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক ইসলামের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি উগ্রপন্থাকে জায়েজ করেছেন রসুলুল্লাহ্কে পাশ্চাত্যের কাছে সন্ত্রাসীরুপে চিত্রিত করার মাধ্যমে ।

ব্রিটিশ রাজনৈতিক তথ্যবিশ্লেষক ক্রিস ব্যাকবার্ণ ২০০৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ইউ এন প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত 'সন্ত্রাসবাদ, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর 'জামায়াতে ইসলামীঃ বাংলাদেশের জন্য হুমকি' শীর্ষক নিবন্ধটি উপস্থাপন করেন(সূত্রঃ ভোরের কাগজ, ২২ নভেম্বর, ২০০৭) । বেশ সংক্ষেপে এখানে প্রাসঙ্গিক ও আমাদের মৌলবাদ নামক রোগের নিরাময়ের উপায় বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঔষধ খুঁজে বের করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু বিবৃত করছি । ব্যাকবার্ণ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, যে ১৯৪১ সালে মওলানা আবুল আলা মওদুদীর হাতে পাকিস্তানের লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম । এর সাংগঠনিক শাখা রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানে । মওদুদী মনে করতেন, যে মুসলিম দেশগুলি (তার ভাষায়) জাতীয়তাবাদ, নারী স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিকৃত পাশ্চাত্য মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে । মওদুদী বিশ্বাস করতেন যে একটি পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হলে ইসলামের বিধানকে আংশিক (ব্যাখ্যার মাধ্যমে) ব্যবহার করতে হবে । তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলিম রাষ্ট্র হবে (যেমন-ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক চরিত্রের পঙ্গু ও অকার্যকর রাষ্ট্র পাকিস্তান , ১৯৪৭ সাল) ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের একটি সংকর, যেখানে একটি অনির্বাচিত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী রাষ্ট্র এবং জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করবে । সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা(মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আদর্শ বা চেতনা) এবং প্রগতির কোন জায়গা থাকবে না । বলব থাকবে সাহাবীদের দাসতান্ত্রিক যুগের ও মধ্যযুগীয় বর্বর ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক শরীয়া আইন ।

মওদুদী প্রভাবিত হয়েছিলেন মিশরে জন্ম নেয়া রাজনৈতিক ইসলামের অন্যতম পথিকৃ মুসলিম ব্রাদারহুড(লক্ষ্য করুন-নামের মধ্যেই সাম্পদায়িকতার বর্ণবাদী গন্ধ লেগে আছে, নামই বলে দিচ্ছে, অন্য ধর্মমতের ও ভিন্নমতাবলম্বীদের কোন স্থান নেই তাদের সম্ভাব্য রাষ্ট্রে) দ্বারা । কুতুবের মতবাদ বা তত্ত্বটি ছিল, একটি বিপ্লবী ইসলামী শক্তি গড়ে তোলা, যারা মৌলবাদী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পরিকল্পনার শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ করবে । তবে মওদুদী এটাকেই একমাত্র পন্থা মনে করতেন না । তিনি মনে করতেন, ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি রাজনৈতিক দল দরকার যাদের কিছুটা হলেও আইনি বা সাংবিধানিক বৈধতা থাকবে এবং তারা যেন প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে পারে ।.....তিনি বিশ্বাস করতেন,(মওদুদীর রণকৌশল) রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করতে থাকলে প্রচলিত ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের আন্দোলন সূচিত করার জন্যও সুযোগ পেয়ে যাবেন এবং যখনই সময় উপুযুক্ত বিবেচিত হবে এবং জেহাদের প্রতি পর্যাপ্ত সমর্থনের ব্যাপারে নিশ্চিত

হওয়া যাবে, তখনই সশস্ত্র জেহাদে নামা হবে । প্রিয় পাঠক, এদের ভন্ডামীটা এবার বুঝুন, একদিকে তারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছে, আবার তেমন একটি সংবিধানের আওতায় সংবিধান-প্রদত্ত গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার আইনের সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ছাতা মাথায় দিয়ে ভেতরে ভেতরে সুদূরপ্রসারী অনিয়মতান্ত্রিক এজেন্ডা ও লক্ষ্য নিয়ে ট্রোজান হর্সের ভূমিকা নিয়েছেন । এটাকে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতি, ধর্মের নামে প্রতারণা ও জালিয়াতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ?

৬. মৌলবাদের অশুভ ও ক্ষতিকারক দিক- ক)এ ব্যাপারে ভূমিকাতেই মোটামুটি আলোচিত হয়েছ । তবে এখানে আরেকটু সম্প্রসারিত করা হবে । মার্ক জুয়ের্গেন্সমেয়ার(Mark Juergensmeyer)*[২৭] যুক্তি দিয়েছেন যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত হয়েছে যখন ফরাসী বিপ্লবের (ফলাফলস্বরুপ এর যে মর্মবাণী বা আকাঙ্খাটি ছিল তার) শিক্ষা ও চেতনা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা চার্চের প্রতি বা ঐতিহ্যের প্রতি ব্যাক্তির আনুগত্যকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দ্বারা প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করল । জিন জ্যাক রুশো জাতিরাষ্ট্রের বৈধতাকে স্থান দিয়েছেন জনগণকে অগ্রাধিকার দিয়ে, চার্চকে নয় । উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে উক্ত মতবাদ যখন বিকাশ লাভ করছিল, জাতিরাষ্ট্রীয় আনুগত্যটি জাতীয়তাবাদের আদর্শের উপর ভিত্তি করেই রুপ পাচ্ছিল । রিচার্ড টি এন্টন জানাচ্ছেন যে এই আদর্শ চারটি মৌল উপাদানে গঠিত হয়েছিল-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শ, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় পরিচয়(যুক্তরাষ্ট্রে যা চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের নীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত বা বাস্তবায়িত হয়); একটি বিশেষ চরিত্রের বা বৈশিষ্ট্যের রাজনৈতিক দল(প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র); এবং ভৌগোলিক এলাকার উপর ভিত্তি করে একটি ভাবাবেগসম্বলিত(জাতীয় আবেগ) আত্মপরিচয় এবং একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি আস্থা বা আনুগত্য ।

জুয়েরগেন্সমেয়ার যুক্তি দিয়েছেন যে, অতীতের ধর্মীয় আন্দোলনগুলো থেকে আধুনিক ধর্মীয় বিক্ষোভ-আন্দোলনগুলোর পার্থক্য হচ্ছে, বর্তমানেরগুলো জাতিরাষ্ট্র বা এর আদর্শকে এবং ধর্মীয় বৈধতার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে প্রাধান্য দেয়াকে লক্ষ্যবস্তু করেছে । এইসব আধুনিক ধর্মীয় আন্দোলন(মৌলবাদী আন্দোলন) ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে । জুয়েরগেন্সমেয়ার আরো বলছেন যে, এসব আন্দোলনকারীরা(মৌলবাদীরা) ধর্মনিরপেক্ষতাকে পশ্চিম থেকে আমাদানী করা নয়া ঔপনিবেশিক আদর্শ বলে গণ্য করে । তারা ধর্মীয় বাগাড়ম্বর, আদর্শ এবং নেতৃত্ব প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে ধর্মভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রের তত্ত্ব হাজির করে । প্রশ্ন হচ্ছে, একই যুক্তিতে ইসলামী আদর্শ বা কৃষ্টিকে কেন আরববহির্ভূত দেশগুলো গ্রহণ করবে নিজেদের বহুযুগের লোকায়ত সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে সেব্যাপারে মৌলবাদী তাত্ত্বিকরা নীরব-বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্রের ধারণার বিরুদ্ধে যারা লেখেন তাদের কলামে এপ্রশ্নের উত্তর থাকেনা । আর ধর্মনিরপেক্ষতা সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক আদর্শ, নাকি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদ -সেটার প্রমাণ চোখের সামনেই রয়েছে-পাকিস্তান, মিশর, সৌদি আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোকে আমেরিকার নয়াউপনিবেশ ছাড়া আর কি বলা যাবে ? আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানিয়েছে সেখানকার মৌলবাদী ও জঙ্গী দলগুলি । ওহাবদের আদর্শ যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে-সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ আধুনিকতার বিরুদ্ধে ওহাবের অবস্থান কেবল সৌদি আরব-পাকিস্তানের মত দেশগুলিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দিক থেকে পশ্চা□পদ ও সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনেরই সুবিধা করেছে । আর মিশর যে মার্কিন নয়া-উপনিবেশ হওয়ার ভাগ্য বরণ করেছে তার কারণ হচ্ছে, সাঈদ কুতুব চক্র কর্তৃক মৌলবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে

নাসেরের প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল ও অস্থিতিশীল করা । প্রজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে ইবনে তায়মিয়ার অর্থোডক্স ইসলাম এবং ইবনে ওয়াহাবের সালাফি ব্রান্ডের প্যান ইসলামিজম(যা আফগানীর উদার ও আধুনিক প্যান ইসলামিজমের সংকীর্ণ রুপ) নাসেরের জাতীয়তাবাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অন্তর্ঘাতমূলক হয়েছিল । কারণ ওয়াহাবী মতবাদ চরিত্রের দিক থেকে জাতীয়তাবাদবিরোধী এবং সেজন্য সাম্রাজ্যবাদের জন্য সুবিধাজনক । নাসেরের ক্ষমতাচ্যুতির ফলে ইসরাঈল, যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন এবং তাদের তেলকোম্পানীগুলোই লাভবান হয়েছে বেশী । তাই সাঈদ কুতুব চক্র কাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তথাকথিত ইসলামী আন্দোলন করেছিল সেটা সত্যিই ভাববার বিষয় ।

খ) দার্শনিক নীৎসে তাঁর অস্তিত্ববাদের দর্শন(Existentialism)-এ দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিমানুষের কর্মের জন্য দৈবশক্তির প্রভাব বা ভূমিকাকে বাতিলকরণ বা তার অনুপস্থিতির ধারণা বা নীতির মধ্যেই তার আপন কর্মের ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ ফলাফলের দায়দায়িত্বটি নিহিত রয়েছে । এই ধারণাকে আরো বিস্তৃত করলে কী দেখব ? প্রথমত ব্যক্তির স্বাধীন স্বত্ত্বার ধারণার নিশ্চয়তা অর্থাৎ সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিমন্ডলে এই স্বাধীন স্বত্তার স্বীকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতার প্রশ্নটি-নিজের এবং সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি ।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির বিবেকের ও ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা, অভাব-অভিযোগ-অপছন্দ-অন্যায়-বৈষম্য প্রভৃতির সুরাহার জন্য বিক্ষোভ প্রকাশের অধিকার, প্রতিকার-সমাধান-পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ বা প্রতিকার দাবী করার অধিকার এবং স্বাধীনতা ইত্যাদির মধ্যেই নিহিত রয়েছে পারস্পরিক দায়বদ্ধতার, মানবমুক্তি, মানবপ্রগতি এবং সমাজ-রাষ্ট্র ও ব্যক্তির কল্যাণের সম্ভাবনা ।

নী□সে যে চার্চকে অভিযুক্ত করেছিলেন যে, চার্চ মানুষের জীবনকে ডিমের খোলসের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে, তা সম্ভবত এই কারণে যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে চার্চ ব্যক্তির স্বাধীন সত্ত্বাকে পদদলিত করছে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও শ্রেয়োবোধের উপর চার্চের ইচ্ছাকে ও ধর্মবিশ্বাসকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে । মধ্যযুগীয় য়ুরোপে চার্চের সীমাহীন ক্ষমতার বর্বর রুপ আমরা দেখেছি । প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী (বা অর্থোডক্সবিরোধী) লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান, ইহুদী, বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানচর্চাকারী ছাত্রদেরকে 'ইনক্যুইজিশন'*[২৮] নামক ধর্মীয় পুলিশ সংস্থার মাধ্যমে ধরে এনে হত্যা করা হয়েছিল । 'সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে'-কোপার্নিকাসের এই তত্ত্বকে সমৃদ্ধ ও প্রচারের জন্য রোমান ইনক্যুইজিশন ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল ।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত গ্রন্থ 'ডায়ালগে' গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন ও সমৃদ্ধ করার 'অপরাধে' তাঁকে রোমান ইনক্যুইজিশনের সামনে হাজির করা হয় ও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় । তাঁর লিখিত ডায়ালগকে নিষিদ্ধ করা হয় । পরে বাকী জীবন তিনি ফ্লোরেন্সে গৃহবন্দী অবস্থায় কাটান । ব্রুনোর সমসাময়িককালে লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেড প্রমুখকে ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয় । এ এক সুদীর্ঘ ইতিহাস.....।

গ) আজকের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আলোচনা কিভাবে প্রাসঙ্গিক ? আজ কি বাংলাদেশে একই ব্যাপার ঘটছে না ? ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কি মৌলবাদী ও উলামাদের ইচ্ছাকে ধর্মের নামে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছেনা ? আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশে মাদ্রাসাগুলো এবং তাদের হেডকোয়ার্টার বায়তুল মোকাররম মসজিদ মধ্যযুগীয় য়ুরোপের চার্চের মতই রাষ্ট্রযন্ত্রের সমান্তরাল একটি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চাইছে । বায়তুল মোকাররম মসজিদকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল ওলামাদের সংগঠন, হাজার হাজার মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল ও মোল্লা-মৌলবীদের সংগঠনগুলি,

এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সাম্প্রতিক ত[]পরতা থেকে তার চিত্র পাওয়া যায় । নারিনীতি ইস্যুতে বর্তমান মৌলবাদঘেঁষা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের একাংশের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের এবং নারী স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ধারাগুলোকে নিজেদের ইচ্ছেমত সংশোধন ও বাতিল করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই লক্ষণটিই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বায়তুল মোকাররম কীভাবে একটি 'চার্চতুল্য' প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন অশুভ প্রতিষ্ঠানরুপে বেড়ে উঠছে ।

এই ধরণের আলামত জাতির জন্য অশুভ পরিণতি বয়ে আনতে পারে । মোল্লাচক্র ও মৌলবাদী গোষ্ঠী(ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো) বায়তুল মোকাররমকে 'রাষ্ট্রের সমান্তরাল একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে' পরিণত করতে সক্ষম হলে, দেশটি একটি নব্য ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হবে । কারণ, তখন ধর্মের নামে গণমানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্খার উপর মোল্লা-মৌলবাদী চক্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে চাপিয়ে দেয়া হবে । এর কুফল আফগানিস্তানে আমরা দেখেছি, ইরানে এখন তা চলছে । সৌদি আরব তো প্রায় প্রতিদিনই শরীয়া কোর্টের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের ঘটনার জন্ম দিয়ে চলেছে, যার সর্বশেষ হলো একজন গণধর্ষিতা নারীকে চাবুক দিয়ে শাস্তি দেওয়ার পর আবার কয়েক মাস জেল দেয়া হয়েছে (তথ্যসূত্রঃমুক্ত-মনা ফোরাম) । ধর্মের নামে তালেবানদের যে মধ্যযুগীয় বর্বর শাসন আমরা দেখেছি-নারীদের স্কুল বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, চাকরী-ব্যবসা করতে না দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা, বেপর্দা হওয়ার অপরাধে বা অবৈধ মেলামেশার অপরাধে প্রকাশ্যে পাথর ছুঁড়ে বা গুলি করে হত্যা করা ইত্যাদি । উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণই ব্যক্তির নিজস্ব রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্বপ্ন ও প্রতিভাকে তথা সৃজনশীলতা ও স্বাধীন সত্ত্বাকে পদদলিত করা হয়েছে ।

এখন, এই বিংশ শতাব্দীর শেষে আমরা কি বাংলাদেশে তেমনই একটি ধর্মরাষ্ট্রের নামে ফ্যাসিবাদী ও বৈষম্যমূলক-নির্যাতনমূলক রাষ্ট্র চাই কীনা সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যস্থা নিতে হবে । গ্রামে-গঞ্জে ফতোয়াবাজীর শিকার হয়ে শত শত নারী আত্মাহুতি দিচ্ছে, নয়তো গ্রামছাড়া হতে বাধ্য হচ্ছে । ধর্ম কোথায় আছে ? মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে ধর্মের কারণে । ফতোয়াবাজি এখন নিরীহ মানুষের সম্পত্তি গ্রাসের মাধ্যমে ধনী হওয়ার অনৈতিক রমরমা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে(দেখুন, শরীয়ার নামে ফতোয়াবাজির বর্বরতা; তথ্যসূত্রঃ সমকাল, ২২ মে ২০০৮ সংখ্যা; শিরোনাম-সুনামগঞ্জের গ্রামে নতুন এক 'বাংলাভাই') । গ্রাম্য সালিশীর মাধ্যমে বিচার-প্রবণতার অব্যাহত বৃদ্ধির মধ্যে আমরা তিনটি অশুভ লক্ষণ দেখতে পাই-১) এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদী কর্তৃক রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধানকে অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা করার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন জেনেশুনে । জেনেশুনে এইজন্যই বলছি যে, যারা এসব করছে, তারা সহজ-সরল কৃষক নয়, এরা অত্যন্ত স্মার্ট, আইন ও সংবিধান সম্পর্কে এরা ভালই খবর রাখে এবং আধুনিক আয়েসপূর্ণ জীবনযাপন করে ।

২) সালিশী বিচার অনুষ্ঠানে মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করা;

৩) ভবিষ্যতে নিজেদের সাধের যে শরীয়া রাষ্ট্র কায়েম হবে বলে এই বর্বর মোল্লাগুলো স্বপ্ন দেখছে, তার প্রস্তুতি স্বরুপ নারীদেরকে গিনিপিগ বানিয়ে টেস্টকেস হিসেবে শরীয়ার বিধান প্র্যাকটিস করছে ।

তো আমরা পছন্দ করি না করি, আমাদের গ্রামভিত্তিক সমাজের আধাসামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের কারণে উপরোক্ত ক্ষতিকর উপাদানগুলি এতে রয়ে গেছে, যেগুলি একটি উদার, মানবিক ও আধুনিক

সমাজ-রাষ্ট্র গঠনের পথে অন্তরায় । কারণ, এমনকি বিচার বিভাগ বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমরা একটা সামন্ততান্ত্রিক মাইন্ডসেট দেখতে পাই, যা দেশে অনেক অঘটন, নৈরাজ্য, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাদের স্বৈরাচারমনস্কতা ও অগণতান্ত্রিক আচরণের জন্য দায়ী ।

ঘ) প্রিয় পাঠক, যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ, স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহের সময় থেকে মিশরে মূসা নবী হয়ে রসূলুল্লাহ্ পর্যন্ত, এই যে এত বিদ্রোহ, ঐশী বাণী প্রচারের আড়ালে সমাজবিপ্লব, এত রক্তক্ষয়, যন্ত্রণা-নিপীড়ন-মৃত্যু এসব কিসের জন্য ? য়ুরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্যস্থানে এত বিপ্লব-বিদ্রোহে লক্ষ মানুষের রক্তদান, এসব কিসের জন্য ? এসবের অন্তর্গত লক্ষ্যটা তো ছিল সভ্যতার বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে, অজ্ঞানতাকে অতিক্রম করে মানবাত্মার মুক্তি ঘটানো ।

কিন্তু আজ যদি মৌলবাদী চক্র বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, এবং ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের একচেটিয়া অধিকারের নামে মতপ্রকাশ ও বিবেকের স্বাধীনতার ধারণাগুলোকে নস্যাত করে দেয়, মৌলিক মানবিক অধিকারের মতো সাংবিধানিক নীতিমালাগুলিকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে(অর্থা undermine করে), যেগুলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতি অনেক ত্যাগ স্বীকারের ভিতর দিয়ে অর্জন করেছে, তাহলে আমাদেরকে আবার একটি মধ্যযুগীয় ফ্যাসিবাদী-বর্বর রাষ্ট্রে ফিরে যেতে হবে । ওলামা চক্র আজ ধর্মের নামে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতাকে নারীসমাজ তথা সমগ্র জনগোষ্ঠীর মতামত-শ্রেয়োবোধের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে একটি বৈধ ও পবিত্র সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে । নারীদের সৃজনশীলতার অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে ।

এভাবে ধর্মীয় মৌলবাদ একটি দেশের সমাজকে স্থবির ও বন্ধ্যা করে দেয় । বদ্ধ জলাশয় যেমন মশক, রোগজীবাণু প্রভৃতি উপাদনের উৎকৃষ্ট কারখানা, তেমনি একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সমাজের পরতে পরতে যখন সর্বগ্রাসী স্থবিরতা ও হতাশা দানা বেঁধে উঠে, তখন সে সমাজের পক্ষে আর বড় মাপের জ্ঞানীগুনি, বিজ্ঞানী, বিচক্ষণ কর্ণধার জন্ম দেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা, ২০০০-এর দশকে আমরা যে প্রেক্ষিত দেখতে পাচ্ছি, যে অস্থিরতা-অবক্ষয় দেখতে পাচ্ছি এর মূলে রয়েছে শুধুমাত্র তরুণ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব নয়, পুরনো প্রজন্মেরও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা । এ ধরণের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে মৃত্যুর পূর্বে লেখা মনস্বী লেখক ওয়াহিদুল হকের একটি কলামে । তিনি লিখেছিলেন,

> '.....বাঙালীর বাছাই করা শ্রেষ্ঠ সন্তানগুলিকে তুলে নিয়ে যায় বধ্যভূমিতে । বাঙালীর বুদ্ধিতে পাঞ্জাবীর পাশবিকতায় বাঙলার ভবিষ্যটি মারাত্মক জখম হয়ে গেল । কতটা জখম হয়েছে বাঙালীর বাস্তবতা এবং বাঙালীর শ্বাস নেবার এবং বিকশিত হবার মানসাকাশ এতগুলি বুদ্ধিজীবি দিবস পালন করেও তার কোন ধারণা পাবার চেষ্টা করেনি বাঙালী, বাঙালী পড়েনা, লেখেনা- সার্থক করে বুদ্ধিজীবি হত্যাকে' ।

ধর্মবিশ্বাসী মুসলিম ভাইয়েরা যদি এলেখা পড়ে থাকেন, তাহলে তাদের বিবেক-বুদ্ধির প্রতি আমার প্রশ্ন থাকবে, মূসা নবীর নেতৃত্ব ফেরাউনের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের(ইসরাঈল জাতিকে) যে অসহযোগ ও বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং মূসা তাওরাত (Old Testament) ধর্মগ্রন্থের যে ধর্মীয় বিধানগুলি নবী দিয়েছিলেন, সেকি শুধু সেসব আদেশ-বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য। নাকি একটি শ্রেয়তর সমাজের স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ? ঈসা বা যীশুর শিক্ষা কি শুধু তাঁর সেই যুগের রীতিনীতিতে থেমে

থাকার জন্য নাকি ভবিষ্যতের কল্যাণময় কোন উন্নত সমাজের জন্য ? যীশু জন্মেছিলেন বর্তমান প্যালেষ্টাইনের বেথলাহাম(Bethlehem) শহরে । তাঁর শৈশব কেটেছিল গালীল প্রদেশের নাজারেথ শহরে । লক্ষ্যণীয় যে তিনি যখন ধর্মপ্রচার করছিলেন, তখন প্যালেষ্টাইনসহ মধ্যপ্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল । তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকে ঈহুদীদের উপর শোষণ-নির্যাতন চলছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে যে ঈহুদীদের যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা যীশুর নবী হিসাবে উত্থাণের সময় পর্যন্ত চলেছিল । রোমান সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তা, বর্বরতা, লুণ্ঠন-অত্যাচার এবং তার বিপরীতে ঈহুদীদের অসহায়ত্ব, রোমানদের স্থানীয় এজেন্ট-শাসকদের স্বার্থপরতা, পুরোহিতদের নৈতিক অবক্ষয় এবং সাধারণ মানুষের নৈতিক আত্নশক্তির অবনতি তাঁর মনে রেখাপাত করে থাকবে । বিপ্লবীদের সমর্থন করার জন্য তাঁর নিজস্ব জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে ভক্ত সাধারণ মানুষকে আহ্বানের জন্য বিপ্লবীদের অনুরোধে তিনি সাড়া দেননি । সম্ভবত তিনি সেটাকে সময়োপযোগী ও দূরদর্শিতার কাজ হবে বলে মনে করেননি-হঠকারী মনে করেছিলেন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । যার ফলে ধর্মের আশ্রয়ে সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন-একথা বোধ করি বলা যায় । এটা কি আমার অনুমান ? প্রশ্ন হলো যে, একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম থাকার পরও, নিজে ইহুদী হয়েও যে যীশু ঈহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন তার কারণ কি ? পন্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি রোমানদের কাছ থেকে ইহুদী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যখন বিদ্রোহীরা গোপনে সংগঠিত হচ্ছিল । এই পটভূমি বিচার করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আসলে তিনি ধর্মের আড়ালে আরেকটি ফ্রন্ট বেছে নিয়েছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল মানুষের লাঞ্চনা-অপমানের অবসান ঘটানো ।

তো যা বলছিলাম, একইভাবে, মুহম্মদ(সঃ) কি তাঁর যুগের দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী ধর্মীয় বিধিবিধান ও রীতিনীতির মধ্যে পৃথিবীর সব দেশের সমাজ পড়ে থাকবে, কেবলমাত্র সেজন্যই ইসলামের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, যখন নারীর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল সেযুগের উপযোগী করে, (ধনীদের জন্য কেনা দাসীদের সঙ্গে সঙ্গম জায়েজ ছিল, এক স্ত্রী থাকা অবস্থায়ও দাসী অথবা একাধিক স্ত্রী রাখা শরীয়ত মোতাবেক বৈধ ছিল যদি খাওয়ানো-পরানোর সংস্থান থাকতো, এটা মানসিকভাবে স্ত্রীদের জন্য বহনযোগ্য ছিল কিনা সেটা সেযুগে বিবেচ্য ছিলনা । আরবে ইসলামপূর্ব যুগে প্রচলিত নারীর প্রতি বর্বরতার অবসান করতে, শরীয়ত প্রচলনের মাধ্যমে তাদেরকে পুরুষের করুণার পাত্রী করা হয়েছিল । হিলা বিবাহ হচ্ছে তখনকার দাসতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী শরীয়া বিধানের ভালো উদাহরণ ।) সেই আকাঙ্খা বা ভবিষ্যত-চিত্রকল্প(Vi si on) তাঁর আরাধ্য ছিল ? নাকি আরো উন্নততর সভ্য সমাজের দিকে মানবসমাজ ধাবিত হবে সে vi si on নিয়ে তিনি ধর্ম প্রচার করেছিলেন ? কিন্তু নারীনীতি নিয়ে ওলামাদের কার্যকলাপ আমাদেরকে ধারণা দিচ্ছে যে, তাঁরা রসুলুল্লাহ্‌র বর্বর যুগে ফিরতে চাচ্ছেন, যা রসূলুল্লাহ্‌ চাননি ।

৭. নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি--প্রোটেস্টান্ট মৌলবাদীদের উত্থাণের ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ভাইরাসের পুষ্টি যেমন পরজীবদেহের মধ্যকার কোষের প্রোটিনে, মৌলবাদীদের পুষ্টি হলো ধর্মবিশ্বাসী দুর্বল মনের মানুষকে দিয়ে । তাদের পুষ্টি রেডিক্যাল উদারীকরণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট দারিদ্র্য, হতাশা, মানুষের অসহায়ত্ব এবং এর ফলে অদৃষ্টবাদিতা ও পারলোকিকতার প্রতি তাদের যে নির্ভরতা তার মধ্যে ।

তাদের বৃদ্ধি বা পুষ্টিকে ভ্যাকুয়াম থিওরীর উপমা দিয়ে চম□কারভাবে ব্যাখ্যা করা যায় । সাধারণ অর্ধশিক্ষিত(এমনকি অনেক শিক্ষিত) মানুষের মস্তিষ্কে যদি আদর্শ-রুচি-অসাম্প্রদায়িক উদার

মানবতা ও মূল্যবোধের চেতনার গ্যাপ তৈরী হয়, তবে সেটা ধর্ম দিয়ে পূরণ করতে চায় । সাধারণ কূপমন্ডুক মানুষের চিরন্তণ স্বভাবই হলো, সে কোন না কোনভাবে জগ সম্পর্কে সাময়িক একটা মীমাংসা খুঁজে পেতে চায় সীমিত জ্ঞান দিয়ে । তাই, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের যে প্রশ্নগুলির বা ইস্যুগুলির কারণে তাকে বারবার মৌলবাদীর দ্বারস্থ হতে হয়, যথা-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা, পরকালে বেহেস্তের ফল লাভের বাসনা এবং নরকভীতি, পারিবারিক বা ধর্মীয় নৈতিকতা-এসবের বিকল্প যে স্বাধীন সত্ত্বার চেতনা ও আদর্শ, সেটা মানুষকে দিতে হবে । সেটা দেয়ার জন্য আমি দুই ধরণের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক মেকানিজ্‌মের প্রস্তাব করছি ।

১. গরীব মেধাবী ছাত্রের জন্য ভার্সিটিতে পড়ার জন্য স্কলারশিপ- ক) বিভিন্ন হিউম্যানিষ্ট ও প্রগিতিমনা ইন্টারনেট সাইট ও ফোরামগুলি এবং প্রবাসে অবস্থানরত বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনগুলির মাধ্যমে একটি কল্যাণ ফান্ড গঠন করতে হবে ।

১) থানা বা উপজেলা পর্যায়ে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি করে দিতে হবে হিসাব, রক্ষণাবেক্ষণ, জনসংযোগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ।

২) ছাত্রদের ক্যাটাগরী অনুযায়ী প্রাথমিক থেকে সিনিয়র লেভেল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান, ধর্ম, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদির বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের সংগ্রহ রাখতে হবে অর্থা একটি আদর্শ পাঠাগারের ব্যবস্থা করা ।

৩) বিজ্ঞান, ধর্ম, পৃথিবীর ইতিহাস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নপত্র তৈরী করা ।

৪) থানা-উপজেলা পর্যয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এক বা দুটি স্কুল বা কলেজের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে বাছাই করতে হবে প্রিটেস্টের মাধ্যমে ।

৫) একটি ঘরভাড়া নিয়ে সেখানে পাঠচক্রের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৬) বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের রেজাল্টের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ফেলতে হবে । যথা-লেভেল-এ, লেভেল-বি ইত্যাদি । ক্যাটাগরির উপর ভিত্তি করে তাদেরকে বোঝার উপযোগী বিষয়ের বই পড়তে দিতে হবে । বই বাসায় নিয়ে যাওয়া যাবেনা, পাঠচক্রের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বই পড়তে হবে । পাঠচক্রের পরিবেশের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে হবে য়ুরোপীয় ষ্টাইলে ।

৭) প্রিটেস্টে যারা ভালভাবে পাশ করবে, তারা পরের রাউন্ডে আরেকটু উচ্চস্তরের কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে ।

৮) দ্বিতীয় স্তরের পরীক্ষার জন্য তাদেরকে বই সরবরাহ করতে হবে এবং নিয়মিত পাঠচক্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

৯) পাঠাগারের পরীক্ষা ও স্কুল-কলেজের পরীক্ষার জন্য বিনা মূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা । এব্যাপারে শহরে অবস্থানরত আমাদের (হিউম্যানিষ্ট বা বামপন্থী) প্রগতিশীল সাহিত্য ক্লাবগুলির সদস্যদের কাছ থেকে ভলান্টিয়ার হিসেবে চক্রাকার পদ্ধতিতে একটি একদিন বা দুদিনের জন্য ক্লাশ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।

১০) প্রথম দিকে প্রতি দুই বা তিন বছরে শুধু একজনের জন্য একজনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা যেতে পারে । তাই, পরীক্ষার অনেকগুলি ধাপ পার হয়ে যেতে হবে-এতে করে তারা যথেষ্ট পরিমাণ বই পাঠ করতে বাধ্য হবে ।

১১) পাঠাগারে পর্যায়ক্রমে একটি-দুটি কম্পিউটার ব্যস্থা করে ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হবে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত-মনার মত সাইটগুলোতে ছড়া-কবিতা, রচনা প্রভৃতি প্রকাশের জন্য উ□সাহিত করে প্রতিভা বিকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।

১২) পাঠাগারকে কেন্দ্র করে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, ইত্যাদির ব্যস্থা করতে হবে । বিজয়ীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে

১৩) পাঠাগারের কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, ইউ-টিউব সাইটের থেকে সংগ্রহ করে আফগানিস্তান-ইরান প্রভৃতি দেশে শরীয়ার নামে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন প্রামাণ্য ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে । ফতোয়াবাজির নামে নারী নির্যাতনের ঘটনার উপর যেসব নাটক বা ছবির ডিভিডি বা সিডি রয়েছে, সেগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করা । যেমন-হাসান মাহ্মুদের 'হিল্লাহ্' নাটকটির চলচ্চিত্র রুপ দেয়া হয়েছে ।

১৪) সংখ্যালঘু নির্যাতনের যেসব প্রামাণ্যচিত্র ইউ টিউব ওয়েবসাইটে আছে, সেগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করা । শ্রদ্ধেয় শাহ্রিয়ার কবীরের কাছে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অনেক প্রামাণ্যচিত্রের ক্যাসেট ও ডিভিডি রয়েছে । তাঁর কাছ থেকে কপি করে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

১৫) পাঠাগারের ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

১৬) পাঠাগার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি সংবাদপত্রের কয়েকটি কপি রাখতে হবে, যাতে কিছু ছাত্র । এভাবে তাদের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ও সচেতনতা তৈরী হবে । ছাত্রদেরকে পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রগতিমনা লেখকের কলাম পড়ার জন্য উ□সাহিত করতে হবে ।

২. ১) যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল লির্বাটিজ ইউনিয়নের অনুকরণে বাংলাদেশে সবগুলি মানবাধিকার সংগঠন, আইনজীবি সংগঠন, নারী সংগঠন মিলে একটি 'সিভিল রাইটস ইউনিয়ন' ইউনিয়ন গঠন করা যেতে পারে । এই সংগঠন মৌলবাদবিরোধী এবং বিভিন্ন মানবাধিকার বা নারী অধিকার ইস্যুতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে । এই সংগঠন মানবাধিকার ইস্যুতে আইনি লড়াই চালাবে ঐক্যবদ্ধভাবে ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রটেস্টান্টদের উত্থাণের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বলা যায় যে, আইনি লড়াই বা আন্দোলনের পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সম্ভাব্য সব ধরণের প্রতিক্রিয়া (বস্তুগত শর্ত), তাদের সাংগঠনিক শক্তির উ□সরুপ উপাদানগুলির অবস্থা ইত্যাদি সবকিছু বিবেচনায় রাখতে হবে । সেখানে মৌলবাদীরা যখন মামলায় জিতেছিল, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির জন্য সেটা নৈতিক বিজয় ঘটেছিল । তাই প্রোপাগান্ডা একটা ভাল অস্ত্র হতে পারে ।

২) ঔষধ দিতে হবে সইয়ে সইয়ে, এই শিক্ষা প্রটেস্টান্ট মৌলবাদীদের উত্থাণ থেকে নিতে পারি । মৌলবাদীরা যখন বেশ কয়েকটি মামলায় হেরে যায়, তার পর থেকেই কিন্তু তারা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সৃষ্টি ও ফান্ড রেইজিংয়ের মাধ্যমে শক্তিবৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল । তাই আঘাত কতটা দিতে হবে সেটা ভেবেচিন্তে মামলা বা আন্দোলনে নামতে হবে । আসলে মামলা বা আন্দোলনের ক্ষেত্রে নৈতিক ন্যায্যতা থাকলেই হলোনা, জনসংযোগের মাধ্যমে, সামাজিক সংগঠন ও ফোরাম সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন মৌলবাদবিরোধী ও মানবাধিকারসংক্রান্ত ইস্যুগুলির ন্যায্যতা সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডার ব্যবস্থা করতে হবে ।

টীকা ও পাদটীকা-

*১. এখানে 'আঘাত' বলতে আদর্শিক বা সংস্কারমূলক প্রভাব বোঝানো হচ্ছে, কোন 'ধর-মার-কাট'-এর মতো ব্যাপার নয় । লেখকের উক্ত বইটি পড়লেই তা বোঝা যাবে ।

২. ফ্রেড্রীখ উইলহেল্ম নীৎসে(১৮৪৪-১৯০০)-উনিশ শতাব্দীর জার্মান দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানী । ধর্ম, নৈতিকতা, সমকালীন সংস্কৃতি, দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সমালোচনামূলক(critique) গ্রন্থ লেখেন । নী□সের প্রভাব দর্শনকে অতিক্রম করে অস্তিত্ববাদ(Existentialism) ও উত্তরাধুনিকতা পর্যন্ত ব্যাপ্তিলাভ করে। অস্তিত্ববাদ(Existentialism)- হচ্ছে একটি জার্মানীতে সংগঠিত একটি দার্শনিক আন্দোলন যাতে প্রস্তাব করা হয় যে ব্যক্তিমানুষই জীবনের অর্থ ও সারবত্তাকে(জীবনবোধ) সৃষ্টি করে, সহজ কথায় জীবনকে অর্থময় করে তোলে-কোনরকম ঈশ্বর-দেবতা বা ঐশী শক্তি সেটা তার জন্য করে দেয় না । অস্তিত্ববাদ স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে স্বীকার করে নেয়,যে অতিপ্রাকৃত বা ঐশী শক্তির অনুপস্থিতির মানে দাঁড়ায়, ব্যক্তি মানুষ সম্পূর্ণরুপে স্বাধীন,
তাই চূড়ান্তভাবে আপন কর্মের দায়দায়িত্ব বহনকারী ।

৩. আয়াতুল্লা প্রথা-'আয়াতুল্লাহ্'(আরবীতে হলো : آية الله)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'খোদার চিহ্ন বা 'খোদার ছায়া' । 'Twelver shi'sm'(আরবীতে 'ইথনাশারীয়াহ্; বা 'দ্বাদশ' শিয়া মতবাদ বা দ্বাদশ ইমাম এ আয়াতুল্লা হচ্ছে ইমামদের সামাজিক প্রভাব দ্বারা সমর্থিত উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় কর্তৃত্ব বা পদবী । আয়াতুল্লাহ্র অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় নেতার কথাকেই নবী বা খোদার কথা বলে মনে করে । কোণ একটি সেক্টের আয়াতুল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারী বা ভক্তদের মধ্যে 'পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্য'-জাতীয় সম্পর্ক থাকে । কোন বিশেষ এলাকার ধর্মীয় নেতা(বা আয়াতুল্লাহ্)-র অনুসারীরা আয়াতুল্লাহ্র কাছে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক(যেমন-স্কুল, মসজিদ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য) ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ ও মুখোমুখি মন্ত্রণা গ্রহণের জন্য আয়াতুল্লাহ্র উপর নির্ভর করে থাকে । পরিবর্তে অনুসারীরা আয়াতুল্লাহ্কে 'পবিত্র আনুগত্য' দিয়ে থাকে যেকোন ব্যাপারে-যেমন, রাজনৈতিক-রাস্ট্রীয় বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইস্যুতে ।

Twelver shi'sm'*(ইথনাশারীয়াহ্)-এটি হচ্ছে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি শাখা বা সেক্ট । এটা দিয়ে পদবীও বুঝানো হয় । এটা এই বিশ্বাস থেকে এসেছে যে 'দ্বাদশ ইমাম' হচ্ছে বারোজন খোদা-নিযুক্ত(Divinely) ইমাম । যিনি ইসলামী জ্ঞান তথা ইসলামী আইনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং দর্শনে বহু বছরের শিক্ষালাভের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞরুপে পরীক্ষিত ও স্বীকৃত তাঁকেই আয়াতুল্লাহ্ খেতাবে ভূষিত করা হয় ।

*৪--গ্রীক পূরাণে কথিত 'পেন্ডোরা'(যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত কিছুর দাতা', 'সমস্ত গুণাবলীর দাতা') ছিল প্রথম নারী । প্রত্যেক গ্রীক দেবতা অনুপম উপহারের মাধ্যমে তাঁকে সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন । দেবতাদের প্রধান জিউস কারিগরি শিল্পের দেবতা হেফিস্টাসকে আদেশ করলেন পেন্ডোরাকে মাটির ছাঁচে তৈরী করতে । এটা ছিল প্রমিথিউসের আগুনের গুপ্ত রহস্য চুরি করার অপরাধে মানবজাতির শাস্তি । সমস্ত দেবতারা তাকে অনিষ্টকর ক্ষমতাসম্পন্ন উপহার দিলেন । আধুনিক ব্যাখ্যানুযায়ী, পুরা কাহিনীর মূল ঘটনা হলো, ওটা ছিল আসলে একটি জার(Jar), যার ঢাকনা পেন্ডোরা খুলে দিয়েছিল এবং যার ভিতর থেকে মানবজাতির জন্য অমঙ্গলজনক সমস্ত কিছুকে মুক্ত করে দিল-লোভ-লালসা, অহঙ্কার, কু□সা রটনা, ঈর্ষা, শত্রুতা, রোগ, হতাশা-নৈরাশ্য, বার্ধক্য, মৃত্যু, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি । শুধু একটি জিনিসই ঐ জারের মধ্যে ছিল- সেটি হলো আশা । তারপর পেন্ডোরা জারটি বন্ধ করে
দিল ।(তথ্যসূত্র-উইকিপিডিয়া, গোগল, ইন্টারনেট থেকে)

*৫-যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের ডুরহাম সিটিতে অবস্থিত ডিউক য়ুনিভার্সিটির মানবিক বিভাগের প্রফেসর এবং 'Duke Islamic Studies Center'(ডিউক ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র)-এর পরিচালক এবং ছয়টি গ্রন্থের রচয়িতা যার মধ্যে রয়েছে 'Shattering the myth: Islam Beyond Violence and Defenders of God : The fundamentalist Revolt Against the Modern age'.

*৬-'Identity'-Identity is a term used throughout the social sciences to describe an individual's comprehension of him or herself as a discrete, separate entity. This term, though generic, can be further specified by the disciplines of psychology and sociology ।

*৭-Family resemblance(পারিবারিক সাদৃশ্যতা)-জার্মান দার্শনিক ল্যুডভিগ উইটজেন্‌ষ্টাইন(১৮৮৯-১৯৫১) প্রস্তাবিত একটি দার্শনিক ধারণামৌল । এই পরিভাষাটি তাঁর ব্যবহৃত একটি রুপকালঙ্কার যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে বুঝানো হয়ে থাকে । এর মূল ভাবটি হচ্ছে, যেসব বস্তু বা ব্যক্তিসমূহকে একটি সাধারণ কাঠামোগত বা গাঠনিক বৈশিষ্ট্যে বা চেহারা দিয়ে সম্পর্কযুক্ত করা যায় বলে অনুমান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে যুক্ত, পারস্পরিকভাবে আংশিক আবরণকারী বস্তুসমূহের সাদৃশ্য দিয়ে সম্পর্কযুক্ত করা যায়, যেখানে কোন বৈশিষ্ট্যই সবগুলোর সাথে কমন বা সাধারণ হয়না ।

*৮-Pluralization-Act of Pluralizing, Pluralism. Pluralism- বহুত্ববাদ; বিভিন্ন জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক উ□স, গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সহাবস্থানের নীতি ।

*৯-য়্যানাবাপ্টিস্ট(Anabaptist)-ষোড়ষ শতাব্দীর য়ুরোপের মৌলিক সংস্কারপন্থী খ্রীশ্চিয়ানগণ যাদের উদ্ভব রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতিমুলক ত□পরতা এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে পরিচালিত কর্তৃত্ববাদী(সামাজিক-রাষ্ট্রীয়) প্রটেস্টান্ট আন্দোলন(Magisterial Protestant Movement) এই উভয় প্রবনতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যেমে হয়েছিল । উক্ত সংস্কারবাদী ধারার জন্ম হয় সুইজারল্যান্ডে।

*১০-বাইবেলের পাঁচটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ- জেনেসিস(Genesis); এক্সোডাস(Exodus); লেভিটিকাস(Leviticus); সাংখ্য(Numbers); ড্যুটারোনমী(Deuteronomy) ।

*১১-মূসায়ী ঐশীত্ব বা পয়গম্বরী(Mosaic authorship)-উপরে বর্ণিত বাইবেলের পাঁচটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মূসা(সঃ)এর মাধ্যমে উদ্ভূত বা সৃজিত বলে ঐতিহ্যগতভাবে যে বিশ্বাস আরোপ করা হয় ।

*১২-Old Testament:পুরানো নিয়ম, ইহুদীরা যাকে তানাক(বাংলায় তাওরাত) বলে থাকে ।

*১৩-New Testament(পুরনো নিয়ম) খ্রীষ্টীয় বাইবেলের দ্বিতীয়ার্ধ বা দ্বিতীয় খন্ডের নাম । প্রথমার্ধ হচ্ছে হিব্রু ভাষায় রচিত ইহুদীদের বাইবেল Old Testament বা পুরানো নিয়ম, ইহুদীরা যাকে তানাক(বাংলায় তাওরাত) বলে থাকে ।

*১৪-প্রেসবিটারিয়ান চার্চ(Presbyterian Church; Presbyterianism)-পশ্চিম য়ুরোপের প্রটেস্টান্ট খ্রীশ্চিয়ানদের সংস্কারকৃত(Reformed) একটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সেক্টগুলির একটি পরিবার । এটি ক্যাল্ভিনপন্থী বা ক্যাল্ভিন মতবাদেরই(Calvinism)-এরই একটি উপধারা ।

*১৫-Moody Bible Institute-খ্রিষ্টীয় ভগবদ্বাক্য-প্রচারকগণ(Evangelist) এবং ব্যসায়ী ড্যুইট লীম্যান মুডি(Dwight Lyman Moody) কর্তৃক ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্ট-ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । যাতে তিনটি প্রধান মন্ত্রক বা বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হয়-শিক্ষা, প্রচার(Broadcast) এবং প্রকাশনা(Publishing) ।

*১৬-Gospel*১৫-খ্রীষ্টের উপদেশাবলী বা জীবনকাহিনী; New Testament-এর* অন্তর্ভুক্ত চারটি বাইবেলীয় ধর্মগ্রন্থের একটি ।

*১৭-Evangel-খ্রীষ্টীয় গস্পেল(The Christian Gospel)

*১৮-প্রকৃতিবাদ(Naturalism)-যে মতবাদে বলা হয় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই(প্রকল্প বা Hypothesis, সাময়িক ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া, পরীক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি-এই প্রক্রিয়া) হলো প্রকৃতিতে ঘটিত বাস্তব ঘটনাকে অনুসন্ধান-তদন্ত করার একমাত্র কার্যকর উপায় ।

*১৯-ম্যাককার্থিজ্ম(McCarthism)- যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহৃত একটি পরিভাষা; চল্লিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রচন্ড কমিউনিষ্ট ভীতি ও সন্দেহবাদ গ্রাস করেছিল বা জনমনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে বোঝানো হচ্ছে । সেই সময় বিশেষ করে মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কমিউনিষ্ট প্রভাব বাড়ছে বলে ভয় ও সন্দেহ বাড়তে থাকে । ত৷কালীন মার্কিন সিনেটর যোসেফ ম্যাক্কার্থীর সন্দেহবাদীতা ও উগ্রনীতি(McCarthy Doctrine)-কে লক্ষ্য করেই পরিভাষাটির জন্ম, যা পরবর্তীকালে আরো ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে(অর্থা৷ কেবল ম্যাক্কার্থীর অনুসৃত নীতি নয়-এটা এখন রুপকে পরিণত হয়েছে) রুপক হিসেবে প্রচলিত হয়েছে । সেই সময় কমিউনিষ্ট হওয়ার অপরাধে বা কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার অভিযোগে হাজার হাজার মার্কিনীকে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা, প্রাইভেট এজেন্সী, ও প্রাইভেট শিল্প-সংস্থার প্যানেল বা তদন্তকমটির তদন্তের নামে হয়রানি ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয় । হাজার হাজার মানুষ অন্যায়ভাবে চাকরীচ্যুত হয় ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সারা জীবনের জন্য তাদের ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যায় ।

*২০-Segregated, Segregation-একটি বর্ণবাদী নীতি; এর দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ও ধর্মের মানুষ পৃথক রেষ্টুরেন্ট, স্কুল, সিনেমাহল, রিয়েল এস্টেট, পাড়া-মহল্লা ব্যবহার করার প্রথা প্রবর্তনের অধিকার চাওয়া হয় । প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল বর্ণবাদীরা এই দাবী জানায় ।

*২১-ইবনে তাঈমিঞা(১২৬৩-১৩২৮)-সুন্নী ইসলামী স্কলার; জন্ম- সিরিয়া সীমান্তের সন্নিকটবর্তী বর্তমান তুর্কীতে অবস্থিত হারানে । তিনি ছিলেন কঠোর শাস্ত্র-আচারনিষ্ঠ এবং কোরাণ ও সুন্নাহ্-এর ভিত্তিতে ঘোর শরীয়াপন্থী । তাঁর সময়ের সূফী ও দার্শনিকদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা(যেমন প্রেম ও ভক্তিমার্গীয় সাধনপথ), ধর্মীয় জ্ঞান ও ব্যাখ্যা এবং তার ভিত্তিতে যে আচার-অনুষ্ঠান সেসবকিছুর ঘোর বিরোধী ছিলেন । তিনি মনে করতেন যে একমাত্র কোরান ও সুন্নাহ-ই মুসলমানের জন্য মোক্ষলাভ ও বেহেস্তলাভের একমাত্র পথ । তাঁর মতে ধর্মীয় সত্যে পৌঁছানোর জন্য যুক্তিবাদ কোন বিশ্বস্ত ্মাধ্যম নয় । তিনি মনে করতেন, যে ইসলামী আইনশাস্ত্র যেভাবে গ্রীক যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং সূফীমতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল তা ইসলামের জন্য বেমানান । তাঁর সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ঈমাম লিখেছেন যে, তায়মিঞা মনে করতেন, আল্লাহ্ আক্ষরিক অর্থেই বেহেস্তে বাস করেন, আক্ষরিক অর্থেই বেহেস্তের(মহাশূন্য বা আকাশের উপর) উপরে রয়েছেন এবং আক্ষরিক অর্থেই বেহেস্তের সিংহাসনে বসে আছেন ।

*২২-সালাফি(আরবীতে,**سلفي**; যার অর্থ পূর্বপুরুষগণ)-সালাফি আন্দোলনের সূচনা ঘটে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাল আল আফগানী, আব্দুহ, এবং রশীদ রিদার নেতৃত্বে । সালাফি শব্দটির উ৷পত্তি হয়েছে আস-সালাফ আস-সালিহীন শব্দটি থেকে, যার শাব্দিক অর্থ পূণ্যশীল ধার্মিক
পূর্বপুরুষগণ ।

*২৩-জামাল আল দীন আল আফগানী(১৮৩৮-১৮৯৭)-তাঁর জন্মস্থান নিয়ে বহুকাল যাব৷ বিতর্ক চলেছে এবং সঠিক তথ্য জানা যায়না । তবে, তাঁর শৈশব ও কৈশরকালীন শিক্ষা আফগানিস্তানের কাবুল ও ইরানের তেহ্রানে নিয়েছিলেন । একটি মতে তিনি ইরানের আসাদাবাদে ১৮৩৮ সালেজন্মগ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু প্রচুর পরিমান দলিল(১৮৯১ সালে ইরান থেকে নির্বাসনের পর প্রাপ্ত কাগজপত্রের সংগ্রহ) সাক্ষ্য দেয় যে তিনি ইরানে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে তাঁর শৈশব কেটেছে এবং একটি শিয়া মুসলিম পরবারে তিনি বেড়ে উঠেন ।

*২৪-Nikki R. Keddie, *Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani": A Political Biography*

(Berkeley: University of California Press, 1972), pp. 225-26.

*২৫-টোবাকো মঞ্জুরী(Tobacco Granting)-১৮৯০ সালের মার্চে শাহ্ ব্রিটিশ কোম্পানীকে 'বিশেষ টোবাকো সুবিধা' মঞ্জুর করেন । এর মাধ্যমে ব্রিটিশ লুঠেরা ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানী ইরানের প্রায় সম্পূর্ণ টোবাকো সম্পদের উ□পাদন, বিক্রয় ও রপ্তানী করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে । বিনিময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বা□সরিক মাত্র ১৫০০০ পাউন্ড রাজস্ব দেয়ার এবং বিক্রয়লব্ধ লাভের মাত্র পচিশ শতাংশ দেয়ার ব্যবস্থা রাখে । বিলাসব্যসন ও য়ুরোপ ভ্রমণের কারণে ভেতরে ভেতরে শাহ্ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল ।

*২৬-"আমি পয়গম্বর প্রেরণ করিনা, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরুপে ব্যতীত"....."তাহাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নহে"....."আমি আপনাকে তাহাদের সংরক্ষক করি নাই এবং আপনি তাহাদের কার্য্যনির্বাহী নহেন"....."আপনি তাহাদের বলিয়া দিন, আমি তোমাদের উপর খবরদারকারী নহি "..... ।-সূরা আল্ আনাম, আয়াত ৪৮,৫২,৬৬, ৬৯ ও ১০৭ ।

"(হে রসূল) বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তা হইতে আগত । অতএব, যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, এবং যাহার ইচ্ছা অমান্য করুক" ।....."আমি রসূলদিগকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরুপেই প্রেরণ করি ।"-সূরা কাহ্ফ, আয়াত ২৯ ও ৫৬ ।

*২৭-Mark Juegensmeyer-যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয় ও সান্তা বারবারা য়ুনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব, বৈশ্বিক গবেষণা ও ধর্মীয় গবেষণার প্রফেসর । তাঁর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে-গান্ধীর পথ, স্রষ্টার মনে সন্ত্রাস, ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিশ্বব্যাপী উত্থাণ ইত্যাদি ।

*২৮-Inquisition-(১২ শতাব্দী থেকে মোটামুটি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত)- সাম্রাজ্যের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতার জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক যে বিচারের প্রথা প্রচলিত ছিল । এই স্পেন, রোমান সাম্রাজ্য এবং পর্তুগালে প্রচলিত ছিল । ইনক্যুইজিশনের বিচারে বিধর্মীদেরকে নির্যাতন বা মৃত্যুদন্ড দিয়ে হত্যা করা হতো । এটা ছিল এক ধরণের গোপন পুলিশ ও বিচার সংস্থা । ১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমের নবম পোপ গ্রেগরী ইনক্যুইজিশন প্রতিষ্ঠা করেন । ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিচার প্রথা মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে । ইনক্যুইজিশনের মাধ্যমে ইয়োরোপে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয় ।

রবিউল ইসলাম, লেখক ও গবেষক। ইমেইল - rblislam@yahoo.com